
তের
র্শ
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

গম্বুজে হাতের স্পর্শ

গম্বুজে হাতের স্পর্শ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৭৯

প্রকাশক
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
মনোজ বিশ্বাস

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

ছ' টাকা

রমাপদ চৌধুরী

অগ্রজপ্রতিমেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

রাজা যায় বনবাসে

শেষদৃশ্য

একটি জলের রেখা

এক

ওরা জাহাজের মুখ লাইট-হাউসের বাঁদিকে ঘুরিয়ে দিল। এখন সূর্য মাথার ওপর। আর জাহাজের চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ী সব দ্বীপ, কোনটা উটের মতো আবার কোনটা প্রাচীন জন্তুর মতো মুখ হাঁ করে সমুদ্রের ওপর ভেসে রয়েছে। কোন দ্বীপকে দেখে মনে হয়, ছাতা মাথায় দিয়ে কোন মানবী, একেবারে উলঙ্গ হয়ে আছে সমুদ্রের বুকে। বিচিত্র এইসব দ্বীপ, ছোট ছোট। মনে হয় খেলনা মাফিক। দ্বীপের পাশ কেটে কেটে জাহাজটা বন্দরের দিকে এগুচ্ছে। জাহাজীরা, যাদের হাতে কাজ নেই—যারা আর ওয়াচে নামবে না, কারণ জাহাজ বন্দর ধরছে বলে, ওয়াচ যাদের ভেঙে দেওয়া হয়েছে তারা রেলিঙে ঝুঁকে এইসব খেলনার মতো পুতুলগুলো নিয়ে নানা রকমের রসিকতা করছিল।

পাথরের মানবীর মাথায় ছাতা, ঝড় বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো জাহাজীরা সেই মানবীর পাশ কাটিয়ে যেতেই সবাই বলল, ভ্যাখ ভ্যাখ, এই দ্বীপের পাহাড়টা কেমন একটা মেয়েমানুষের মতো হয়ে আছে। কেউ কেউ বলল, জলে নেমে যাব নাকি শালা! চুমু খেয়ে আসব।

কেউ বলল, এতটা জল ভেঙে না হয় ওঠা যাবে দ্বীপে, কিন্তু ওর শরীর বেয়ে কাঁধে চড়ে বসতে শালা তোমার কোমর ভেঙে যাবে।

পুলক শুধু কিছু বলল না। যতক্ষণ জাহাজটা পাশ দিয়ে গেল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বন্দর থেকে বেশিদূর নয়। ডানদিকে তাকালে লাইট হাউস। এই লাইট হাউস রাতে জাহাজের উদ্দেশ্যে আলো ফেলে এবং নানা রকমের বয়া বাঁধা আছে, বয়ার আলোগুলো প্রায় মালার মতো এই সব দ্বীপের চারপাশ বেষ্টন করে আছে।

কারণ দ্বীপের নিচে পাহাড়, বস্তুত অতল সমুদ্র থেকে এইসব পাহাড় সমুদ্রের ওপর অগ্রভাগ ভাসিয়ে কেমন দুষ্টু বালকের মতো ডুব দিয়ে আছে। জাহাজের কাপ্তেনকে পাইলটের সাহায্যে সন্তর্পণে জাহাজ চালিয়ে নিতে হয়। পাইলটের প্রতিটি পাহাড়ের অগ্রভাগ চেনা। তাই কাপ্তেনের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হত না জাহাজ চালিয়ে নেওয়া, বন্দর থেকে পাইলট উঠে এলে তবে তার রক্ষা।

উলঙ্গ মানবীর মতো যে পাহাড়টা জলের ওপর ভেসে রয়েছে ওর নাম ডিভাইন লেডি। ছুটির দিনে, অথবা রবিবারের বিকেলে, যদি সমুদ্রে ঢেউ অথবা ঝড় না থাকে, তীর থেকে এইসব পাহাড়ে ছোট ছোট স্কীপে অনেকে চলে আসে। ছোট ছোট ফার্ন জাতীয় গাছ, ওপরে নীল আকাশ, নিচে নীল সমুদ্র। এবং এমন উদার আকাশের নিচে বসে বড় ইচ্ছা করে দু'হাতে হাত নিয়ে অথবা প্রিয়তমের মুখ দেখতে দেখতে এইসব নির্জন নিরিবিলি পাহাড়ে সময় কাটিয়ে দিতে। যারা আসে তারা প্রায় যুবক যুবতী। এখানে এলে সবাই সাদা রঙের স্কার্ট পরে আসে। একটা সংস্কার আছে এ দেশের মানুষদের। এখানে খৃষ্টের জন্মদিন পালনের সময় কেউ অন্য রঙের পোশাক পরে না। এইসব ছোট ছোট দ্বীপ শুধু প্রেম ভালবাসার জন্য। প্রেম ভালবাসা মানেই বিশুদ্ধ একটা ব্যাপার এবং সাদা রঙ তার প্রতীক।

এত সব, নতুন জাহাজীরা জানবে কি করে। সব চেয়ে যে প্রাচীন নাবিক জাহাজী ইমাদুল্লা, সে এসব বলছিল। নতুন জাহাজীরা নিবিষ্ট মনে শুনছিল সব। ওরা ক্রমে নানা রকম গল্প-গাথার ভিতরে দেখল, বন্দরে জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে। এখন আর সেই সব পাথরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। কারণ বড় একটা পাহাড়, নাম ওর লায়ন রক, সব এখন ঢেকে দিয়েছে।

পুলক কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য জাহাজীরা যখন সেই মূর্তি দেখে নানা রকমের রসিকতা করছিল, অথবা খিস্তি খেউড়

তখন সে চুপচাপ সেই আশ্চর্য পাহাড়ের অগ্রভাগ নিবিষ্ট মনে দেখেছে। প্রকৃতি কি বিস্ময়করভাবে এই সমুদ্রের ওপর একটা নীল রঙের পাথর দিয়ে এক যুবতীকে এঁকে রেখেছে। বিরাট এই যুবতীর শরীর কি মসৃণ মনে হয়েছে! স্বর্গীয় সুষমা যেন মুখে। দূর থেকে চোখ মুখ স্পষ্ট নয় খুব। আদৌ চোখ মুখ আছে কিনা এবং দূর থেকে সেই মানবী যে নীল রঙ গায়ে মেখে জাহাজীদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দিচ্ছিল তা কতটা নীল, অথবা কাছে গেলে আদৌ মসৃণ কিনা ত্বক, এবং চোখের মণি কালো কিনা, যা দূর থেকে পাহাড়টাকে যতটা যুবতী মনে হয় কাছে গেলে তার কতটা ঠিক ঠিক শরীর নিয়ে বেঁচে আছে জানার জন্য সে এ সময় ইমাহুল্লাকে খুঁজল। কারণ সে ইমাহুল্লাকে ওদের সামনে কোন প্রশ্ন করে নি। প্রশ্ন করলেই বলত, আবার শালা পুলক ক্ষেপে গেছে।

সে নিরিবিলি কোন জায়গায় খুঁজছিল ইমাহুল্লাকে। ইমাহুল্লা এই বন্দরে এবার নিয়ে সাতবার এসেছে। ইমাহুল্লা এ বন্দরে একবার প্রায় এক নাগাড়ে অনেক দিন ছিল। স্ট্রাইক জাহাজীদের এবং সরফাই হবে জাহাজে, সরফাই হলে দেখা গেল জাহাজের বয়লার বসে গেছে। বয়লার মেরামত এবং অন্যান্য কাজ সারতে সারতে জাহাজটা এক নাগাড়ে অনেক দিন কাটিয়ে দিল। তখন শীতকাল ছিল না। গ্রীষ্মকাল, আকাশ পরিষ্কার, আপেলের বাগানে মরশুম লেগেছে, চারপাশে যত সব গাছ-গাছালি আছে সবার ডালে ডালে পাতায় পাতায় কি সুষমা! পাহাড়ের নিচে যেসব পথ আছে, সে পথে কত হরেক রকমের দোকানি নানারকমের ফুল নিয়ে বসে থাকত। এখন শীতকাল, কি তীক্ষ্ণ শীত, হিমেল হাওয়া। জাহাজীরা প্রায় প্রত্যেকেই হাতে দস্তানা পরে কাজ করছে। সেই গ্রীষ্মকালে শীত ছিল না, আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে এবং সমুদ্রে ঢেউ ছিল না বলে ইমাহুল্লা স্কিপ ভাড়া করে এইসব দ্বীপে চলে এসে বিকেল এবং অনেকদিন রাত কাটিয়ে গেছে। ইমাহুল্লা বলেছে, এক আজব নগরী

মনে হবে, মনে হবে তুমি জ্যোৎস্না রাতে এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের ভিতর ঘুমিয়ে আছ অথবা জেগে আছ।

সে প্রশ্ন করল, ইমাহুল্লা সেই মানবীর মুখ তুমি ভাল করে দেখেছ ?

ইমাহুল্লার চোখ কেমন প্রথম হতবাক হয়ে গেল। সে কি বলবে ভেবে পেল না। বস্তুত, সমুদ্রের কাছে এসব খেলনা হলেও ওর কাছে এসব ছোটখাটো লম্বা পাহাড়ের সামিল অথবা মূর্তিগুলো এত বেশি অতিকায় যে সে নিচে গিয়ে দাঁড়ালে প্রায় কোন অতিকায় পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এমন মনে হত তার। স্পষ্ট সব কিছু দেখা যেত না। সে পায়ের নোখগুলির ধার দেখেছে এবং নোখগুলি বাজপাখি প্রায়, যেন হাতির দাঁতের চেয়ে মোটা। এবং সেই পাহাড়টায় অর্থাৎ যে পাহাড়ের অগ্রভাগ সমুদ্রের ওপর মানবীর মতো ভেসে রয়েছে, সেখানে সে গিয়ে উঠলে দেখতে পেত, বড় এক মাঠের মতো বেদী এবং বেদী এত মসৃণ যে হাঁটতে গেলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। ওর পা দুটোর চারপাশে সে ঘুরতে পারত না। কারণ পাহাড়টা মাঝখানে প্রায় ঘাগরার মতো হয়ে আছে। দূর থেকে যতটুকু উলঙ্গ মনে হয় কাছে গেলে তাও মনে হয় না। ওপরের দিকে তাকালে মনে হয় মুখটা আকাশের দিকে নিবদ্ধ। সে চোখ দুটো অথবা মুখ দেখতে পায় নি। সুতরাং ইমাহুল্লা ওর কথার জবাবে কি বলবে ভেবে পেল না। একবার ভাবল, সে বলবে দেখেছে। সে ওর শরীর বেয়ে সেই সত্তর আশি ফুট ওপরে উঠে দেখে এসেছে। বস্তুত সেখানে সেই মানবীর শরীর বেয়ে ওঠা যায় না, এবং এত খাড়া যে কোন সময় পা হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। একমাত্র যখন এই অঞ্চলে তুষার ঝঞ্ঝা বয়, এবং ক্রমে, ঝঞ্ঝা কমে এলে তুষারপাত হতে থাকে, তারপর ক্রমে বরফ পড়তে থাকলে চারপাশের সমুদ্রে বরফ জমে যায়, অতি উৎসাহী যুবক যুবতীরা তখন শোনা যায় সাইকেলে সমুদ্রের ওপর বরফ ভেঙে এই সব দ্বীপে চলে আসে।

এবং পাতলা মই বেয়ে ওপরে উঠে যায়। পড়ে গেলেও হাত পা ভাঙার ভয় থাকে না। তুষার পাতের জন্য নরম কোমল একটা হু'তিন ফুটের আস্তরণ চারপাশে থাকে। ওদের পক্ষে সম্ভব হলেও ইমাহুল্লা মই পাবে কোথায়। সে তাই চোখ দেখতে পায় নি। সে শোনা কথাই বরং পুলককে নিজের চোখে দেখে এসেছে এমনভাবে যেন বলে দিল।

—চোখ নেই পুলক। সে ধীরে ধীরে এ কথাটা বলল। ইমাহুল্লার বয়স এখন অনেক। কত বয়স সে নিজেও জানে না। নলিতে ওর একটা বয়সের হিসাব আছে, সেটা মনগড়া হিসেব। চাকরির জন্য হিসেব। ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায় সে এখন খুব সিরিয়াস। বরং এতক্ষণ যারা ওর পাশে ছিল, যেমন গঙ্গা, আলতাফ, ওরা সবাই যা জানতে চাইত, এই পুলক তার চেয়ে একেবারে আলাদা। ওরা ফিসফিস করে বলে গেছে, তুমি চাচা কেন যেতে সেখানে আমরা জানি।

—কেন!

ওরা কিছু না বলে দাঁত বের করে হাসত।

ইমাহুল্লা বলত, বেকুফ। আমার কি সে বয়স আছে।

—তখন কি তুমি আর এখনকার মতো বুড়ো-হাবড়া ছিলে?

—তোরা জানিস না, তোরা যা জানিস না তা আমাকে বলতে আসিস না। আমি যে বয়সে জাহাজের কাজ নিয়ে আসি, সেটা তোদের এখনকার বাপের বয়স।

ওরা বুঝতে পেরেছিল, চাচা রেগে যাচ্ছে। সুতরাং রেগে গেলে চাচা যা তা বলে দেয়। ওরা চলে গেলেই এসেছিল পুলক। জাহাজ ঘাটে বাঁধা হচ্ছে। জেটি বয়রা এখন হল্লা করছে। এবং ক্রেনগুলোর ছায়া লম্বা হয়ে গেছে। দিন ছোট বলে মাথার ওপরে যে সূর্য ছিল, নিমেষে তা সমুদ্রের ওপাশে হেলে পড়েছে। এবং এক সময় সমুদ্রে ডুবে গেছে। মনে হয় না দিন এত ছোট হতে পারে। এখন

ওদের অন্ধকারে এই নিশীথে কাজ করতে হবে। চারপাশে নানা রকমের আলো, এবং জেটির ওপর আলোর মালা। জাহাজের সব আলো জ্বালা হয় নি, কেন যে জ্বালা হয় নি বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং ডেকের ওপর অন্ধকার। এই অন্ধকারেই জাহাজীরা ছুটে ছুটে কাজ করছে। হাসিল ফেলে দিচ্ছে। ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরছে। উইনচে স্টীমের শব্দ। পুলকের ওয়াচ নেই। সে এনজিনরুমের জাহাজী। ওদের ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ইমাহুল্লা। সামনে সেই লায়ন রক, রকের ওপারে সেই ডিভাইন লেডি এবং বিচিত্র সব পাহাড়ের শীর্ষ ভাগ আর ডানদিকে সেই লায়ন রকে লাইট হাউস সমুদ্রের ওপর। আলোটা বৃত্তাকারে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে এখন। যত জাহাজ আসবে এ বন্দরে, আলো ফেলে ফেলে ওদের সেই লাইট হাউসটা পথ দেখাবে।

ইমাহুল্লা বলল, লেডির মুখ চোখ কিছুই নেই পুলক। এবার ইমাহুল্লা কেমন সরল কথাবার্তা বলতে থাকল। একবার আমি রাত কাটিয়েছিলাম। কেউ কেউ রাত কাটাতে যায়। আমারও শখ হয়েছিল। এখান থেকে ধরো প্রায় মাইল দশেক হবে। এই দশ মাইল আমাদের জাহাজ কি ধীর গতিতে এসেছে বুঝতেই পারছ। স্কিপ নিয়ে গেলে ঘণ্টা খানেকের পথ। যদি তোমার পথটা চেনা থাকে। না চেনা থাকলে তুমি এমন সব দ্বীপের গোলমালে পড়ে যাবে যে সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। তখন তোমার মনে হবে, সমুদ্রের সেই আদি প্রেতাত্মা তোমাকে ঘুরিয়ে মারছে।

প্রাচীন নাবিকের গন্ধ রয়েছে এই ইমাহুল্লার গায়ে। পুলক যত বন্দরে গেছে সে এই ইমাহুল্লার সঙ্গেই যা কিছু বন্দর সম্পর্কে কথাবার্তা বলেছে। কারণ পুলক জাহাজে উঠে আসার পর থেকেই বড় বিষণ্ণ। সে বড় বেশি কথা বলে না। জাহাজ থেকে আজকাল বেশি নামে না। বন্দরে যায় না। মেয়েমানুষ জাহাজে এসে বিরক্ত করলেও সে

ফুর্তি করার জন্য নেংটা হয় না। বরং সে তার ফোকশালের দরজা বন্ধ করে রাখে। কিছু বই নিয়ে এসেছে সঙ্গে। ইংরেজী, বাংলা, সেগুলো সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। পয়সা হলে সে বন্দর থেকে দুটো একটা বই কিনে নিয়ে আসে। এবং কোন কোন বন্দরের সৌন্দর্য ওকে মুগ্ধ করলে একা নেমে বাসে চড়ে দূরে চলে যায়। কোন পাহাড়ের নিচে, পাথরের গায়ে সে একটা নাম লিখে আসে। নামটা বড় ওর প্রিয়। নামটা একটি সুন্দর বাঙালী মেয়ের। যে লম্বা, এবং যার লাবণ্য ভরা শরীর। সে সাদা জমি আর লাল রঙের পাড় দেওয়া শাড়ি পরতে ভালবাসে। সে মেয়ের নাম নন্দিনী। নন্দিনী আমি এখন একটা পাহাড়ের কোলে ওক গাছের নিচে বসে আছি। সে, গাছের কাণ্ডে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে এমন লিখে রাখে। অথবা পাথরের গায়ে লিখে রাখে ছোট্ট দুটো কথা, নন্দিনী আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছো ?

নতুবা অন্য সময় জাহাজে সে বড় বিষণ্ণ। সে কাজ করে। সে কাজ আর কাজের ভিতর ডুবে থাকে। সে সেই পাঁচ বছর আগে এক নিস্তব্ধ দুপুরে ঘর ছাড়া হয়েছিল, আজও সে তাই আছে। তার বয়স যদি তখন বিশ থাকে, এখন তার পঁচিশ হয়েছে। সে যদি তখন নন্দিনীকে ভালবেসে থাকে, সে এখন তাকে তবে স্বপ্নের ভিতর নিয়ে গেছে। নন্দিনী, মেয়ের নাম নন্দিনী। নন্দিনী বড় সুন্দর তুমি। তোমার চোখ এই দূর দেশেও আমি বর্ষার দিনে অথবা তুষারপাত হলে পোর্টহোলে স্পষ্ট মনে করতে পারি।

—তা হলে ওর চোখ নেই ইমাদুল্লা চাচা !

—না।

—মুখ নেই।

—না।

—তবে কি আছে।

—কি আছে জানি না। পায়ের কাছে দাঁড়ালে ওর চোখ মুখের কথা তোমার মনেও আসবে না।

—এত সুন্দর।

—এত সুন্দর পুলক!

—রাতে যে থাকলে, কি দেখলে?

—দেখলাম নিশীথে সেই বাতিঘরের আলো এসে বার বার সেই মূর্তির ওপর কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাচ্ছে। তারপরে আবার ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখছে সমুদ্রে, ফের এসে আলোটা মূর্তির ওপর থেমে থাকছে। একটা আশ্চর্য রকমের মায়া তৈরি হয় তখন। তুমি সেটা দেখার জন্য সারারাত সেই মূর্তির পায়ের কাছে পড়ে থাকবে।

—তুমি একবারই গেছ চাচা।

—একবারই। আর যেতে পারি নি। কারণ তারপর যতবার এসেছি সে শীতকালে। চারপাশে তুষারপাত। সমুদ্রের ওপর বরফ পড়তে থাকে। বরফ ভাসতে থাকে। সমুদ্রে বরফ একেবারে পাটির মতো বিছিয়ে না গেলে যাওয়া খুব রিস্‌ক্। আর যেতে পারি নি।

—এবার শীতকালে এসেছি আমরা।

—সুতরাং তোমার যদি যাওয়ার ইচ্ছা থাকে যেতে পারবে না। এটা জুন মাসের প্রথম। জুলাই মাসের শেষাশেষি এখানে সমুদ্রের জল বরফ হয়ে যায়। ততদিন জাহাজ এখানে থাকবে না। থাকলে তুমি আমি এক রাতে সাইকেল যোগাড় করে, দেখে আসব।

—বুড়ো মানুষ তুমি। তোমার কষ্ট হবে যেতে।

—যাওয়ার একটা নেশা আছে। সেই কবে একবার দেখেছি এখনও চোখের ওপর দৃশ্যটা যেন ভাসছে।

পুলক ইমাহুল্লার চোখ দেখে টের পেল, সে যাবেই। পুলক

ভাবল, এক রাতে যাওয়া যাবে। যারাই আসে তারা এই দৃশ্য না দেখে বড় যায় না। পুলক মনে মনে সেখানে যাবে স্থির করল। যদি জাহাজ ততদিন এ বন্দরে না থাকে, তবে সে একটা স্কীপ ভাড়া করে যাবে। সেখানে সে ধারালো ছুরি দিয়ে নন্দিনীকে লিখবে, আমি এখানেও এসেছিলাম। নিশীথের জ্যোৎস্নায় আমি সারারাত তোমাকে প্রত্যক্ষ করেছি।

দুই

বন্দরের চারপাশটা এখন নির্জন। শীতের রাত বলে এই নির্জনতা আরও ভয়াবহ। দূরে গির্জায় ঘণ্টা বাজছে এবং হু হু করে ঠাণ্ডা শীত দক্ষিণ মেরু থেকে অথবা আবাস্টুন পাহাড় থেকে নেমে আসছে। বন্দরের বাড়ি ঘর ছোট ছোট। খুব বড় অট্টালিকা চোখে পড়ে নি। অধিকাংশ কাঠের বাড়ি। লাল নীল রঙের কাঠ দিয়ে যেন বাড়ি-গুলো তৈরি। শীতের রাতে ওদের কাচের জানালায় শিশিরের টুপটাপ শব্দ কান পাতলে শোনা যাবে। এই ঠাণ্ডায় ডেকে কেউ নেই। যে যার মতো ফোকশালে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে এবার। তখন মনে হল বন্দরের পথ ধরে কেউ একটা লণ্ঠন হাতে এদিকে নেমে আসছে।

পুলক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছিল। শীতে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ফোকশাল গরম রাখার জন্য যে সামান্য ব্যবস্থাটুকু আছে তা পর্যন্ত ঠাণ্ডা মেরে গেছে। জাহাজীরা যে যার ফোকশালে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ছে। কেবল এনজিন ভাণ্ডারির কাজ শেষ হয় নি। সে মেসরুমে বসে কিছু খাবার আগলাচ্ছে এখন।

এই শীতের রাতে মেজ-মালোম গেছেন কিনারে। কাপ্তান নিজের ঘরে বসে এখন হয়ত বাইবেল পড়ছেন। এবং কোয়ার্টার

মাস্টার গ্যাঙওয়েতে বসে ভাবছিল সেই লণ্ঠনের আলো এদিকে নেমে আসছে কেন ? এই শীতে নির্জন এই জেটিতে এমন একটা আলো কেমন ভয়াবহ। দূরের সমুদ্র তেমনি শান্ত। কেবল সেই ঠাণ্ডা হাওয়া ! কারণ তুষারপাত আরম্ভ হবার আগে এমন একটা ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া এই সব উপকূলে বইতে থাকে। যারা মেষপালক যারা তৃণভূমিতে মেষের পাল অথবা গরুর পাল নিয়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা এই ঝড়ো হাওয়া বইতে দেখলেই তাদের জীবজন্তু নিয়ে শহরের কাছে চলে আসবে, এবং যার যা কিছু আছে যেমন মেষ, গরু, বাছুর সব কিলখানায় ঢুকিয়ে দিয়ে যে যার দেশে চলে যাবে। এই শীতের রাতে, কোন উৎসব না থাকলে এমন নির্জন এক জেটিতে কেউ নেমে আসে না। অথচ একটা লণ্ঠন ক্রমে শেষ ক্রেন পার হয়ে এই জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে।

পুলক চায়ের জল গরম করতে ওপরে উঠে এসেছে। সে দেখল লণ্ঠন হাতে কে এখন গ্যাঙওয়ের সিঁড়ি ধরে জাহাজের ওপরে উঠে আসছে। ওরা ফসফেট নিয়ে এসেছে জাহাজে। লণ্ঠন হাতে এজেন্ট অফিস থেকে কেউ আসবে না। আর যখন জেটিতে তেমন অন্ধকার নেই, তখন কেউ হাতে লণ্ঠন নিয়ে জাহাজে উঠে আসতে পারে ভাবাই বিস্ময়ের। সে জল গরম না করে ওভারকোটের কলারটা উঁচু করে দিল। এবং যে স্কার্ফটা গলায় জড়ানো আছে সেটা মাথায় তুলে ডেক ধরে হাঁটতে থাকল। ওর মনে হল সেই লণ্ঠন হাতে মানুষটা কোয়ার্টার মাস্টারকে কি যেন বলছে !

ডেকের যমুনাবাজুর উইংসে একটা লাল মতো আলো জ্বলছে। সে আলোটার নিচে এসে দাঁড়াল। এবং এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যার হাতে লণ্ঠন তিনি একা নন। পিছনে কেউ যেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা শেডের মতো জায়গায় ওরা দাঁড়িয়ে কি বলাবলি করছিল, সে কৌতূহল আর নিবৃত্ত করতে পারল না।

কারণ লণ্ঠন হাতে যখন নিশ্চয়ই কোন কিনারার মানুষ হবে। যেন কিছু হারিয়েছে ওরা। এই জাহাজে ওরা তা খুঁজতে এসেছে।

সে আরও দু পা এগিয়ে গেল। জল বসিয়ে এসেছে উনুনে। জলটা গরম হয়ে পড়ে যেতে পারে। এত শীত যে একটু চা না খেতে পারলে শরীর গরম হবে না। দাঁত প্রায় শক্ত হয়ে আসছে। এবং এবার বোধহয় ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে। পুলক সামনে যেতেই দেখল একজন প্রায় বৃদ্ধা গোছের মানুষ এবং অন্যজন যুবতী কি কিশোরী এই সামান্য আলোর ভিতর বোঝা যাচ্ছিল না। বৃদ্ধার হাতে লণ্ঠন। সে যেন প্রায় অনেকদূর থেকে হেঁটে এসেছে এমন চোখ মুখ এবং ক্লান্ত। কিশোরী মেয়েটি কোন কথা বলছে না। সে তার ঠাকুমার কথা শুনছে।

কোয়ার্টার মাস্টার সিরাজ ভাল ইংরেজি জানে না। এবং সে ওদের কথা ঠিকমতো ধরতে পারছে না। কোয়ার্টার মাস্টার পুলককে দেখেই বলল, এরা এই জাহাজে কিছু বোধহয় খুঁজতে এসেছে।

পুলক বলল, গুডইভিনং মাদাম। আপনারা এই ঠাণ্ডায় জাহাজে ?

বৃদ্ধা বললেন, তুমি মিস্টার একটা খবর দিতে পার।

—কি খবর বলুন।

—এই জাহাজটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে ত ?

—এটা কোথা থেকে ঠিক এসেছে আমি বলতে পারবো না মাদাম।

বৃদ্ধা কেমন বিস্ময়ের চোখে তাকাল। মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে তার ঠাকুমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন ঠাকুমার ছায়া ওর শরীরে আবছা অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। সেই মেয়েটি ওর দিকে এখন কেমনভাবে তাকাচ্ছে পুলক বুঝতে পারছে না। সেও এমন একটা কথায় বিস্মিত হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছে না। জাহাজের ওপর এই লণ্ঠন তুলতে দেখে

যারা জাহাজের শেষ বাঁধাছাঁদার কাজ করে ফিরছিল তারা পর্যন্ত এদিকটাতে জড় হতে লাগল।

পুলক বলল, মাদাম, আপনাকে আমি কোন মস্করা করছি না। পুলকের এই স্বভাব। সে সহজে কোন কিছু ব্যাপারে স্থির না হয়ে কিছু প্রকাশ করে না। সে বলল, মাদাম, জাহাজটা ইংরেজদের। কলকাতা থেকে জাহাজী নিয়েছে। আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে বের হয়েছি সেই দশমাস আগে। কিছুদিন আগে আমরা গিনিতে ছিলাম। তার আগে সেন্টিসে। সূর্য মাথার ওপর উঠলে আমরা জাহাজ ছেড়ে গেছিলাম ওসানিক আয়র্লেণ্ডে। কত দেশ ঘুরে আমরা এখানে এসেছি। ভারতবর্ষ থেকে এ জাহাজ আসে নি। জাহাজ ইংরেজদের। আমরা জাহাজ নিয়ে আপনাদের বন্দরে এসেছি ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে।

বৃদ্ধা এবার কিছু বলতে চাইলে পুলক বলল, এই শীতে আপনি বড় কষ্ট পাচ্ছেন। যদি কিছু না মনে করেন, আমাদের ফোকশালে এসে বসতে পারেন। আপনার সব কথা শুনে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি।

বৃদ্ধা এবার লণ্ঠন তুলে পুলকের মুখ দেখল। লণ্ঠনটা তুলতেই আলোর কিছু অংশ সেই মেয়ের মুখে গিয়ে পড়েছে। যা এতক্ষণ অস্পষ্ট ছিল এবং এতক্ষণ যা রহস্যময় ছিল। এখন পুলক এবং অন্যান্য জাহাজীদের চোখে একেবারে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। এত সুন্দর এবং বিষণ্ণ মুখ সে পৃথিবীর কোন বন্দরে যেন দেখে নি। সে এতক্ষণ যে সরল সহজভাবে কথা বলছিল, মেয়েটির মুখ দেখেই সে আর তেমন সরল সহজ থাকতে পারল না। সে কেমন নিজের ভিতর গুটিয়ে গেল। কোথায় যেন তার এমন একটা মুখ দেখা। বড় চেনা চেনা। সে যেন কবে কোন পাথরের গায়ে এমন একটা মুখের ছবি এঁকে রেখেছিল। সে আর সেজন্য কিছুই বলতে পারল না। কেবল বলল, আমি সব-আপনাকে বলতে পারব না।

আমাদের জাহাজে ইমাহুল্লা চাচা আছে। তার কাছে আসুন সে আপনাদের সব সমস্যা শুনলে নিশ্চয়ই সমাধানের একটা সূত্র বের করে দিতে পারবে।

পুলক, গঙ্গা, জিয়া হায়দর সবাই সেই তুইজন আগন্তুকের সঙ্গে নিজেদের ফোকশালের দিকে হাঁটতে থাকল।

আকাশ পরিচ্ছন্ন। বোধ হয় এটা কৃষ্ণা চতুর্দশী হবে। নতুবা আকাশের নক্ষত্র এত উজ্জ্বল কেন। প্রায় ঝলমল করছে সারা আকাশ। শীতের রাতেই আকাশ সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন থাকে, পুলকের এমন মনে হল ডেকে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি বড় ধীরে ধীরে হাঁটছে। মেয়েটা তার ঠাকুমার জন্য এত ধীরে হাঁটছে কিনা জানে না, না ওর স্বভাবই এমন, পুলক ডেক পার হতে গিয়ে তা ধরতে পারছে না। সে নিচে সিঁড়ি ধরে নামবার আগে জিয়াকে বলল, কেটলির জলটা ফুটছে কিনা দেখতে। এবং না ফুটলে সে যেন আরও তু-কাপ জল দিয়ে দেয়। যারা আগন্তুক এসেছে তাদের জন্য এই তু-কাপ। তবে আর ভিন্ন করে চা বানাতে হবে না।

সিঁড়ির মুখে এলে পুলক বলল, এমন খাড়া সিঁড়ি ভাঙতে আপনার কষ্ট হতে পারে। আমার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন, এই বলে সে তার শক্ত কাঁধ বাড়িয়ে দিল।

ইমাহুল্লা চাচা জাহাজের বড় টিণ্ডালের কাজ করে। তার ফোকশালে সে একা। এনজিন সারেঙের ফোকশাল পার হলেই ইমাহুল্লা চাচার ফোকশাল। পুলক এবং গঙ্গা, যমুনাবাজুর মোহন সবাই এসে গেল নিচের টুইন ডেকে। ওরা ওকে ইমাহুল্লার ফোকশালে ঢুকিয়ে দিল।

ইমাহুল্লা তখন তামাক খাচ্ছিল। সে দেশ থেকে আসার সময় একটিন রাব আর এক বস্তা তামাকের পাতা এবং কিছু বেনারসের জর্দা পাতার আরক সঙ্গে নিয়ে আসে। আর সঙ্গে আনে গড়গড়ার নল। রুপোর বাঁধানো গড়গড়া, এক ডজন কলকে। কারণ ঝড়

উঠলে জাহাজ বড্ড দোলে। সে তার কলকেটাকে সুতোয় বেঁধে রাখে। এবং ঝুলিয়ে রাখে বাঙ্কের নিচে। খুব বেশি দোল খেলে জাহাজে উল্টে পাল্টে যায় সব। কলকে ছিটকে গিয়ে অন্য কোনখানে দুখান হয়ে ভেঙে পড়ে থাকে। ইমাদুল্লা বড় প্রাচীন আর হিসেবী জাহাজী। সে কত ধানে কত চাল হয় জানে। কতদিনের সফরে কটা কলকির দরকার তার জানা। ব্যাঙ্ক লাইনের সফর হলে কবে ঘরে ফেরা যাবে তার ঠিক থাকে না। কেবল সমুদ্র এবং সমুদ্র, এবং বালিয়াড়ি, দ্বীপপুঞ্জ চারপাশে, অথবা শীতের দেশে বরফ পড়ছে তো পড়ছেই। এসব সবই জানা আছে ইমাদুল্লার। সে দু মাসে একটা কলকি, এই হিসাবে এক ডজন কারণ ব্যাঙ্ক লাইনে উঠলেই বিশ বাইশ মাসের সফর না হয়ে যায় না। সেই ইমাদুল্লা বেশ শীতের ভিতর কম্বল গায়ে চুপচাপ প্রায় নামাজের ভঙ্গীতে বসে তামাক টানছিল, তামাক টানা শেষ হলেই কলকিটা উপুড় করে রাখবে। বালিশে তিনটি থাপ্পড় মারবে, মেরে চারপাশের যত কিছু আছে সব বন্ধন করে দেবে, কারণ ইমাদুল্লার বয়স যত বাড়ছে তত জীন পরি অথবা ভূত-প্রেতের ভয় বাড়ছে। আর এই সব জাহাজে কত কিছু থাকে, সে নিশীথের জ্যোৎস্নায় কতদিন এমন সব বিচিত্র জাহাজের গল্প করেছে যে কাপ্তানের চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেছে ভয়ে। সেই সব গল্প সময় পেলেই পুলককে বলে। অথবা অন্যান্য জাহাজীদের হাতে যখন কাজ থাকে না, ডেকের কাজ শেষ, সাফ-সুতরোর কাজ শেষ, অথচ এজেন্ট অফিস থেকে জাহাজ ছাড়ার কোন নির্দেশ আসছে না—তখন আর কি করা, ডেকের ওপর বসে মাদুরে শুয়ে বসে থাকা অথবা এই ইমাদুল্লা চাচার সেই সব পুরানো সফরের অভিজ্ঞতার কথা শোনা—শুনতে শুনতে কাপ্তান ত কাপ্তান, বুড়ো মানুষ, জোয়ান মানুষ, মায় পুলক, যে শিক্ষিত নাবিক জাহাজে যার সংস্কার বলতে কিছু নেই, যে ভয়ঙ্কর সৎ এবং সাহসী সেই মানুষের পর্যন্ত ভয়ে টেঁসে যাবার অবস্থা।

সুতরাং পুলক ওদের যে কি ভেবেছিল! ওরা কি জাহাজে আদৌ মানুষ হিসাবে এই শীতের রাতে এসেছে! সে অবাক, কারণ এতক্ষণে যেন মনে হচ্ছে লণ্ঠন নিয়ে আসার কি কারণ থাকতে পারে! ইমাহুল্লা চাচা সব জানে। সব বোঝে। সে দেখলেই সব টের পেয়ে যাবে।

ইমাহুল্লা চাচা ওদের দেখেই চিনে ফেলেছে। সে তাড়াতাড়ি নল ফেলে উঠে দাঁড়াল, আরে আপনি! বলতেই সেই বৃদ্ধা লণ্ঠন তুলে ওর মুখ দেখল।

—তুমি ইমাহুল্লা না?

—জি আমি ইমাহুল্লা।

—যাক বাঁচা গেল। বলে হাতে স্বর্গ পাবার মতো সে বাক্সের ওপর বসে পড়ল। একটু থেমে বলল, তুমি অনেকদিন পর এদিকটায় এলে তবে!

—আজ্ঞে তাই। আপনার শরীর ভাল।

বৃদ্ধার মাথায় কালো ঝালরের ক্যাপ ছিল। সে ওটা খুলে ফেলল। সারামাথায় সাদা চুল। হাতে সাদা ফানেলের গরম দস্তানা। পায়ে রাবারের হাঁটু পর্যন্ত জুতো। এবং গায়ে লম্বা ল্যাদার জ্যাকেট। ইমাহুল্লা এবার দরজার পাশে মুখ তুলতেই দেখল একজন সুন্দর মতো মেয়ে চুপচাপ নাবিকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম সে বুঝতে পারে নি মেয়েটিকে। কার সঙ্গে মেয়ে এই রাতে জাহাজে উঠে এসেছে। সে বিস্ময়ের চোখে তাকাতেই বৃদ্ধা কি বুঝতে পেরে বলল, আরে তুমি ওকে চিনতে পারছ না?

ইমাহুল্লার চোখ সামান্য সংকুচিত হল। সে বলল, না। ঠিক চিনতে পারলাম না মাদাম ইলিয়া।

—আমাদের ত্রাউস!

—ত্রাউস! এত বড় হয়ে গেছে? বলেই সে যেমন লাফ দিয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়, তেমনি সে সহসা নিস্তেজ হয়ে বসে পড়ল

—সেই কবে এসেছি! বলে সে মিনমিনে গলায় বলল, কত বছর আগে! সে কর গুণে হিসাব করে বলল, তা তেরো বছর হয়ে গেছে। তখন ব্রাউস শিশু। কত বছর বয়েস ছিল মাদাম ইলিয়া তখন ব্রাউসের?

—চার বছর হবে।

—ভুলে গেছি সব। কত সহজে মাদাম ইলিয়া আমাদের সময় পার হয়ে যায়। ইমাহুল্লা কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বে ডুবে গেল যেন।

পুলক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা যে রহস্যজনক নয় এখনই ইমাহুল্লা সব খুলে বলবে তাকে এবং খুলে বললে সে সবটা বুঝতে পারবে কারণ এই ইমাহুল্লা যেন সব জানে, বোঝে, কোন সমুদ্রে কত জল। সে প্রায় পুলকের কাছে ঈশ্বরের সামিল—তবু ইমাহুল্লা গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানছে এবং আয়েসি মানুষের মতো গল্প করছে দেখে পুলক মনে মনে রাগ না করে পারল না। সেই নিয়ে এসেছে ওদের ইমাহুল্লা চাচার কাছে, অথচ চাচা এখন ওর দিকে একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত, এরা কারা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না, এবং কেন রাতে লণ্ঠন নিয়ে এই জাহাজে উঠে এসেছে, যেন উঠে আসাই স্বাভাবিক, না এলেই বরং সেই রাতে ওদের খুঁজতে বের হতে হত, এমন মুখ নিয়ে চাচা ওদের সঙ্গে কথা বলছে। এমন কি পুলককে কোন কথা বলছে না পর্যন্ত। পুলক ভাবল, ধুস শালা, কাম কি দাঁড়িয়ে থেকে, নিজের ফোকশালে গিয়ে সে শুয়ে পড়বে এমন ভাবল এবং সে এইটুকু ভেবে দরজা অতিক্রম করতেই কড়া গলা চাচার, পুলক কোথায় যাচ্ছ। ওদের জন্য কিছু গরম কফি। একবার ভাণ্ডারিকে ডাকলে হয়। পুলক ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে, বলল, ইনি হচ্ছেন মাদাম ইলিয়া আর এ হচ্ছে ব্রাউস মিলান। এরা ইলিয়া পরিবারের মানুষ। এবং এই ইলিয়া পরিবারের সাত পুরুষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিল। এদের আচারে ব্যবহারে কিছুটা ভারতীয় সংস্কৃতি আছে। এ-মাসটা ওদের

পরিবারের মৃত্যুমাস। এই মাসেই হিসেব করে দেখা গেছে প্রায় সকলেই ওদের মারা গেছেন। এরা গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসে। এবং এই শহর থেকে কিছু দূরে ছোট্ট এক পাহাড়ের মাথায় ওদের ছবির মতো বাড়িটা দেখলে বাড়িটাকে না ভালবেসে পারবে না।

একটু থেমে ইমাহুল্লা বলল, আমাদের পুলক। পুলক বসু। বছর পাঁচেক হল জাহাজী হয়েছে। এ বন্দরে প্রথম, সৎ সাহসী, এবং বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কেন যে ছোকরা জাহাজে মরতে এল বুঝি না। তোমরা তো জান আমাদের দেশটা এখন ভাগ হয়ে গেছে। এই বছর সাত-আট হল ভাগ হয়েছে, কি খবর রাখ না! ইলিয়াকে সামান্য সংকুচিত দেখাল। তোমরা ভারতবর্ষে ছিলে। যুদ্ধের সময় চলে এসেছ। ব্রাউসের বয়স তখন বোধহয় বছর খানেক। আমি এলাম বছর তিনেক বাদে। আমাদের কনভয় তোমাদের ভেড়ার মাংস, আপেল আর গম নেবার জন্য এসেছিল। সে একটা দিন গেছে!

ইলিয়া বলল, তা গেছে।

ইমাহুল্লা বলল, তখন আমরা ছিলাম এক দেশের মানুষ। ভারতবর্ষের মানুষ। এখন পুলক হিন্দুস্থানের আর শালা আমি পাকিস্তানের। আমার শালা বড় বিদঘুটে স্বভাব, বড় বেশি কথা বলি। তা পুলক দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। কিরে গঙ্গা বেশ যে দেখছিস শালা! যা যা। শুয়ে পড়গে। এখানে ভিড় জমাবি না।

পুলক বলল, চাচা, চায়ের জল গরম করেছিলাম।

—তবে ঐ চাই করে দাও। কি মাদাম, আর কিছু! কিছু শুকনো বিস্কুট দিতে পারি। পনির দিতে পারতাম, কিন্তু বেটা স্টুয়ার্ডকে এখন পাওয়া যাবে না। সে শালা ঠিক কিনারায় নেমে গেছে।

মাদাম ইলিয়া বললেন, না না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এক্ষুনি উঠব।

—আপনার যেতে কষ্ট হবে না! বেশ দূর। সেখানে এই রাতে ওকে একা নিয়ে যাবেন। বলে ইমাহুল্লা ত্রাউসের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

—আমাদের গাড়ি আছে!

—তখন কিন্তু আপনাদের গাড়ি ছিল না।

—ত্রাউসের বাবা লাইট-হাউসে কাজ পেয়েছে। সে সরকার থেকে একটা গাড়ি পায়। বলেই কি বলতে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল মাদাম ইলিয়া।

এবার যা বলবে বলে ভেবেছিল, মাদাম ইলিয়ার রুগ্না কন্যা অর্থাৎ ত্রাউসের মার খবর নেবার জন্য মুখ বাড়াতেই চা নিয়ে এল পুলক। এই শীতের রাতে চা-টুকু এত বেশি লোভনীয়, এত বেশি ভাপ উঠছে যে ইমাহুল্লা সেই গরম চায়ে হাত রেখে হাত গরম করতে চাইল।

ত্রাউস এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। পুলক এমনিতেই বিষণ্ণ থাকে, কথা কম বলে। ঠিক ইমাহুল্লার বিপরীত। অনেকক্ষণ থেকে পুলক একটা কথাই ভাবছে, এরা জাহাজ বাঁধতে না বাঁধতেই কেন ডেকে এসেছে। এবং সে ইমাহুল্লাকে দেখে ঠিক টের পেয়েছে, সে গোটা ব্যাপারটা জানে। তাই ওর মুখে কোন বিস্ময়ের রেখা ফুটে নেই। ওরা চলে গেলেই যেন ইমাহুল্লা সব খুলে বলবে।

পুলক আলগা করে চা ঢেলে দিল ত্রাউসের কাপে। হাত খুব বেশি গোলাপী রঙের এবং নীল শিরা উপশিরা সব ভাসমান, আর এইসব দৃশ্য ওর দস্তানার ভিতর থেকে প্রায় ফুটে বের হবার মতো। ত্রাউস ডান হাতের দস্তানা খুলে ফেলেছে। না খুলে ফেললেও সে যেন ধরতে পারত কত উজ্জ্বল আর নীল রঙ নিয়ে এই শরীর এই সমুদ্রের তীরে এক পাহাড়ের ছায়ায় অথবা আপেলের বাগানে বড় হচ্ছে। চোখ বড় বড়। চুল বব করে কাটা। পায়ের পেশী নরম। এবং যেমন লম্বা তেমনি ডিমের মতো মসৃণ মুখখানিতে

বড় বড় চোখ দুটো প্রায় প্রতিমার মতো। সে বসেছিল। ওর দুহাত সামনে। ওর সাদা রঙের পোশাক গায়ে। কোমরে লাল রঙের বেল্ট আঁটা। পায়ে সাদা চামড়ার জুতো। নীল রঙের মোজা। এক আশ্চর্য সুষমা নিয়ে মেয়েটা চুপচাপ বসে আছে। কথা বলছে না। পুলকের ইচ্ছা হল একবার কথা বলে। অথচ সে যে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

এখন অন্যান্য জাহাজীরা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। কোনো দূরের গির্জায় রাত আটটার ঘণ্টা পড়ছে। বেলা চারটা না বাজতেই রাত নেমেছিল ডেকে। এখন তাই ওরা যেন গভীর নিশীথে জাহাজটার ভিতর সকলে ডুবে আছে। মেয়েটা একটা কথাও বলছে না। বিষণ্ণ প্রতিমার মতো এই কোকশালের চারপাশটা দেখছে। স্টিয়ারিং এনজিনের শব্দ নেই। কেমন নিঃসাড়ে জাহাজটা এ বন্দরে পড়ে আছে!

অথচ ওরা যে কেন এসেছে পুলক বুঝতে পারছে না। লণ্ঠনটা বাঙ্কের নিচে নিবু নিবু করে রাখা হয়েছে। ওদের ওঠারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইমাতুল্লা বলল তখন, ওর মা কেমন আছে।

বৃদ্ধা কোন জবাব দিলেন না। চোখ মুছে ফেললেন। এই বয়সে কেবল কোন দুঃখের কথা মনে হলেই কান্না আসে তার। ইমাতুল্লা কি টের পেয়ে বলল, সেই রোগেই গেছে?

ইলিয়া ঘাড় নাড়ল শুধু। ব্রাউস কোন কথা বলছে না দেখে ইমাতুল্লা ইলিয়ার দিকে তাকাল।

—এও তাই।

—এত অল্প বয়সে!

—তাই দেখছি। এখন আর কিছু ভাবি না। যা হবার হবে। এটা তো বংশানুক্রমিক। এমন হয়ে আসছে বার বার। আমার বড় ছেলেকে তো ভারতবর্ষের মাটিতে রেখে এসেছি। ভেবেছিলাম এই দেশের জল হাওয়া হয়ত কোন প্রতিরোধের কাজ করতে

পারে! কোথায়! ছোট ছেলেটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। মেয়ে জামাই সঙ্গে ছিল। ভাবলাম যাক অন্তত মেয়েটা বাঁচবে।

ইমাদুল্লা বলল, তোমার দাদা এবং কাকা দুজনই তো এমন একটা রোগে গেছেন বলেছিলে।

—কবে থেকে যে চলে আসছে জানি না। এই এক বিষণ্ণ হয়ে যাওয়া। দিন রাত কি যে এক বিষণ্ণতা কাজ করে জানি না।

—তুমি তো দীর্ঘদিন বেঁচে গেলে!

—আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না ইমাদুল্লা। কেমন দুঃখের গলায় কথাটা বলল ইলিয়া।

ইমাদুল্লা বলল, আমাদের কবে যেতে হবে?

—কালই।

—যদি জাহাজ না ভিড়ত আজ?

ইলিয়া চুপ করে থাকল। কয়েক বছর থেকে এটা হয়েছে। গত বছর একটা জাহাজ কোচিন থেকে এসেছিল এ সময়ে, তার আগের বছর সব মাসেই কোন না কোন জাহাজ এসেছে, কিন্তু জুন মাসে কোন জাহাজ আসেনি। ফলে কাউকে বলাও হয়নি।

কোন ভারতীয়কে খাওয়াতে পারেনি বলে খুব খারাপ গেছে বছরটা।

ইলিয়া লণ্ঠনের আলো উসকে দিল। তারপর উঠে পড়ার সময় বলল, কখন যাচ্ছ।

—সকাল সকালই চলে যাব ছুটি নিয়ে। সঙ্গে এই ছোকরা নাবিককে নিয়ে যাব। কেমন হবে? বলে সে ব্রাউসের দিকে তাকাল।

ব্রাউস কোন উত্তর করল না। ইলিয়া বলল, বুঝতে পারছ! এখন আর চেষ্টা করি না কিছু। রোজ গির্জায় যাই সঙ্গে নিয়ে।

ওরা চলে গেলে পুলক প্রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলল, এরা কারা, কেন এসেছে, কিসের জন্য যেতে হবে কিছুই জানালে না চাচা।

—এখন ঘুমোতে যাও। কাল সকালে যখন যাব তখন সব বলা যাবে।

—এত আলো থাকতে এই লণ্ঠন হাতে এখানে আসা!।

—সবই বলা যাবে। রাত হয়েছে। সারেঙের ঘুম ভাঙলে রেগে যাবে। চুপ চাপ শুয়ে পড়োগে। সকালে আবার ছুটি নিতে হবে।

পুলক জানে এখন আর ইমাতুল্লা চাচা কোন উত্তর দেবে না। গঙ্গা, আলতাফ এবং অন্যান্য জাহাজী যারাই ছিল, বলল, চাচা, আমরাও যাব। আমাদের ফেলে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

পুলক ডেকের ওপর উঠে গেল। ক্রেনের নিচে ওরা এখন হাঁটছে। ক্রমে ওরা জেটি পার হয়ে গেল। এটা জুন মাস। এই মাস এবং মাস শেষ হলে ক্রমে এই দ্বীপে তুষারপাত আরম্ভ হবে। জাহাজ ততদিন থাকবে কিনা সে জানে না। ব্রাউসের একটা অসুখ আছে। মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। সে ডেকের ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ভাবল, তুষার পাতের পর যখন সমুদ্র বরফে ঢেকে যাবে একবার তাকে নিয়ে যাবে সেই মূর্তিটার কাছে। ওরা দুজনে সেখানে চুপচাপ বসে থাকবে। পাঁচ বছর পর এই প্রথম ওর কেন জানি ব্রাউসকে দেখে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ফের অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

তিন

শহরের ঠিক নিচে যে পথটা অকল্যাণ্ডের দিকে গেছে সেই পথে যেতে হবে। ওরা বাসে চেপে বসল। এখন শীতকাল বলেই কৌরিপাইনের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। আপেলের বাগানে যারা কাজ নিয়ে এসেছিল, ওরা এখন ছুটিতে চলে গেছে। বড় বড় কোল্ড স্টোরেজগুলো এখন সব ভেড়ার মাংসে অথবা নানারকম ফলমূলে ভরে উঠবে। এই বন্দর থেকে গম, কাচা মাংস, ডিম এবং ফলমূল রপ্তানি হবে।

আর এই দেশে বরফ পড়ার আগে জাহাজগুলো সব ভেড়ার মাংস, গম অথবা আপেল নিয়ে তাড়াতাড়ি সমুদ্রে পাড়ি জমাবে। তা না হলে বরফ পড়লে চারপাশ বন্ধ। জাহাজগুলো বরফে বসে সমুদ্রের ভিতর অনড় হয়ে গেছে। তখন একমাত্র বরফ কাটা কলের সাহায্যে এইসব জাহাজ গভীর সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং ওরা যখন বের হচ্ছিল বন্দর থেকে তখন চারপাশে যত জাহাজ রয়েছে, সবগুলোতে একসঙ্গে মাল উঠছে। বিশ্রাম নেই। বিরাম নেই। ক্রেনগুলো ঘড়ঘড় শব্দ করছে। ওরা এই সব দেখে ভেবেছিল জাহাজ মাল বোঝাই হতে খুব সময় নিলে পনের-ষোল দিন। তার আগে জাহাজ যে রসদ নিয়ে এসেছে সে সব নামাতে হবে। এইসব দিন এক সঙ্গে গুণলে বড় জোর জাহাজ এক মাসের মতো এই বন্দরে। ওরা এদেশের বরফ পড়া দেখতে পাবে না। পুলক যেতে যেতে বলল, চাচা তোমার কি মনে হয় আমাদের জাহাজের দড়িদড়া তুলতে তুলতে বরফ পড়বে না ?

ইমাহুল্লা বলল, এখন কথা নয়। চারপাশটা দেখ। কি সুন্দর দেশটা। মানুষগুলো আরো সুন্দর, বাসের মেয়ে কণ্ডাকটার ভারি

মজার গল্প বলছিল যেতে যেতে। ওদের বাসটা সমুদ্রের পাশে পাশে যেন ছুটছে। বাঁ দিকে বিস্তীর্ণ পাহাড়ী জমি, উপত্যকা এবং সুন্দর সুন্দর কটেজ, ফার্ম হাউস, তেলের পিপে, নীল রঙের গাছ এবং কৌরিপাইনের ঘন জঙ্গল। এসব দেখে পুলকেরও কেন জানি আর কথা বলতে ইচ্ছা হল না। এখানে এই সব বনে জঙ্গলে নেমে গেলে হত। বনে জঙ্গলে যে সব বড় বড় কৌরিপাইন আকাশের দিকে মাথা তুলে কত কাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম সে সব কাণ্ডে সুন্দর করে লেখা, নন্দিনী আমাদের এ বাদে কোন গত্যন্তর ছিল না। কারণ তুমি আমার সম্পর্কে কাজিন হও। আমাদের ধর্মে তোমার আমার ভালবাসা অবৈধ। তোমার বিয়ের দিনে আমি কি খেটেছিলাম। এমনভাবে মনপ্রাণ দিয়ে আর কোথাও আমি কাজ করতে পারি নি। বিয়ে বাড়ির হৈচৈ কখন থেমে গেছে, আমি কখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন তোমাদের বাসর এসব কিছুই টের পাইনি নন্দিনী। কেবল সকালে দেখেছিলাম আমার শরীরে কে একটা গরম চাদর দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিল। টের পাচ্ছিলাম ভোর রাতের দিকে আমার সামান্য শীত করছে। টের পাচ্ছিলাম কেউ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। গোটা বাড়িটাতে তখন ক্লান্তি। সকলে ঘুমে আচ্ছন্ন। টের পাচ্ছিলাম। আমার কপাল থেকে কে চুল সরিয়ে সামনে মুখ নিয়ে আসছে। বুঝলাম তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাস। আমাকে ঘুমের ভিতর বড় কাতর করছিল। আমি তবু জেগে যাইনি। জেগে গেলে আমি যেন আমার এতদিনের ভালবাসার সম্মান রাখতে পারতাম না।

সে ভাবল, এত সব কি লেখা যায় একটা গাছের কাণ্ডে! কিন্তু সে যেখানেই গেছে কিছু না কিছু পাথরে অথবা গাছের কাণ্ডে লিখে এসেছে। যেন সে বলতে চেয়েছিল, নন্দিনী আমার এ-ভালবাসা নিরন্তর সুষমা বয়ে বেড়ায়। আমি গাছে গাছে

পাতায় পাতায় কত কথা লিখতে চাই। এসব তোমাকে বললে, তুমি হয়ত আমাকে ছেলেমানুষ ভাববে, বলবে, বড় আবেগধর্মী মানুষ আমি, তবু বলি কেন যে আমি পৃথিবীর যত বন্দরে গেছি, তোমার আমার কথা লিখতে ভালবাসি। তোমার আমার কৈশোরের প্রেম গাথা, অথবা নদীর পারে ছোটা, কাশবনে হারিয়ে যাওয়া, সূর্যাস্তে হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফেরা এবং শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তোমাদের বাড়িতে যেদিনটিতে চলে আসি, তোমার সেই সুন্দর চোখের হাসি কেন জানি এখনও আমি ভুলতে পারি না। যা আমি বন্দরে বন্দরে পাথর এবং পাহাড়ের গায়ে লিখে বেড়াচ্ছি। আমার মনে হয় এই যে আমাদের ভালবাসার পৃথিবী, যেখানেই গেছি শুধু মনোরম দৃশ্য, এই যেমন এখন এক মনোরম দৃশ্যের ভিতর আমরা ত্রাউসের কাছে যাচ্ছি। ত্রাউসকে দেখে আমার মনে হয় সেও তেমন এক পৃথিবীর সন্ধানে আছে। তাকে সেই পৃথিবীটা কেউ এনে দিতে পারছে না। সে ক্রমে বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। সে বিষণ্ণ হয়ে গেলেই আজ হোক কাল হোক সে মরে যাবে। কেন যে সে এমনভাবে মরে যাবে বুঝি না। আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি। এই মাসে ওরা প্রতিদিন দুজন ভারতবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। অন্তত প্রতিদিন না হলেও একদিন খাওয়ানো চাই। কারণ ওদের পূর্বপুরুষরা সকলেই ভারতবর্ষের মাটিতে সমাহিত হয়েছেন।

সে ভাবল, ত্রাউস বড় সুন্দর নাম!

সে দেখল বাসটা ছোট্ট পাথরের পাহাড়, কোনো গাছগাছালি নেই তার নিচে থেমেছে। চাচা হাতে ইসারা করে ডাকল। সে নামার সময় দেখল, ওরা সুন্দর একটা ছবির মতো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ভদ্রলোক ইমাদুল্লাকে দেখেই ছুটে আসছে। যেন কত আপনার জন কত দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে। পথের ডান পাশে বালিয়াড়ি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। সমুদ্রের

গর্জন আসছে। নীল রঙের সমুদ্র বালিয়াড়ি পার হলে আর বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের ছোট্ট পাঁচিল যেন ও-পাশের মরুভূমি সদৃশ উপত্যকা থেকে বাড়িটাকে রক্ষা করছে। বাড়িটা কাঠের। দুপাশে সবুজ ঘাসের লন, এবং নুড়ি বিছানো পথ, পাশে পাশে গোলাপের কেয়ারি। এত বড় গোলাপ ফুল পুলক কোন দিন দেখে নি। আর বাসটা রাস্তার ওপর। সাদা রঙের বাস। জানালায় ত্রাউসের মুখ দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধা গাড়িবারান্দায় ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। সবই ছবির মতো। ওপরে আকাশ, নিচে বালিয়াড়ি, সমুদ্র, এবং সবুজ রঙের গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ের নিচে লাল রঙের বাড়ি। ইমাহুল্লা বলল, যিনি আসছেন তাঁর নাম মগো মিলান। ত্রাউসের বাবা হন তিনি।

মিলান হ্যাণ্ডস্যাক করল। ওদের আগে আগে হাঁটতে থাকল। সামনের গোল মতো বারান্দায় উঠে আসতেই বৃদ্ধা ইলিয়া ছুটে এলেন। কি খুশী সে! বারান্দায় লাল কার্পেট পাতা। সবুজ রঙের বেতের চেয়ার। ফুলদানিতে সব বিচিত্র ফুলের গাছ। মিলানের সঙ্গে ইমাহুল্লা পুলককে পরিচয় করিয়ে দিল। মিলানের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব অমায়িক আর আবেগপ্রবণ। খুব মনে হয় হাসতে পারে। মনেই হয় না মিলানকে দেখে যে তার মেয়ে ত্রাউস সেই নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে ধরা পড়েছে। ইমাহুল্লা মিলানকে ঠিক আগের মতোই খুশী দেখে বলল, তোমার লাইট-হাউসে আমরা একদিন বেড়াতে যাব ভাবছি।

—খুব আনন্দের কথা।

—তোমার ডিউটি কখন থাকে ?

—ও ঠিক থাকে না। আমাদের সুবিধা মতো ভাগ করে নিই। মাসখানেকের ছুটিতে আছি।

—তোমাদের সেই বড় মিসলটোস লতার গাছটা দেখছি না ?

—ত্রাউসের মা যে বছর মারা যায় সে বছর গাছটাও মরে গেল।

—ত্রাউসকে একবার ডাকো দেখি। দেখি মুখখানা।

—একেবারে কথা বলে না!

—কথা বলে না কেন? এবার পুলক প্রশ্ন না করে পারল না।

মিলান কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইমাহুল্লার দিকে তাকাল। ইমাহুল্লা বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে পুলকের কথার কোন জবাব দিল না। শুধু বলল, তুমি যাও না পুলক, ত্রাউস কি করছে দেখে এস।

মিলান চায়, মিলান কেন, যারা এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত তারাই জানে ইলিয়াদের বংশে এই দুরারোগ্য ব্যাধি ক্রমান্বয়ে পুরুষানুক্রমিক চলে আসছে; সকলেরই যে হয় তা না—তবু অধিকাংশ যুবক যুবতীকে এমন একটা রোগে পেয়ে বসলে, দিনের পর দিন চুপচাপ, হাসে না কথা বলে না—প্রাণে বিন্দুমাত্র ঐশ্বর্য যেন নেই; সব কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে—কখনও এভাবে আত্মহত্যা, কখনও খাওয়া কমে আসে, কখনও এক অজীর্ণ রোগ দেখা দেয় এবং এভাবে এক অতি নাটকীয় মৃত্যু এই ইলিয়া পরিবারের মানুষদের জন্য প্রতীক্ষা করে। সুতরাং মিলান চায়, মিলান কেন, সকলেই চায়, এই যে দুঃখটা ত্রাউসকে এক ঘোরতর বিপদে বন্দী করে রেখেছে তা থেকে যে ভাবে পারা যায় মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হোক। মিলানেরও সায় ছিল কথাটাতে। পুলকের বাঙালি চেহারা সুন্দর, চুল ব্যাকব্রাস করা। নাকটা একটু চাপা, চোখের চেয়ে ভ্রূ প্রশস্ত। এবং উঁচু লম্বা মানুষ পুলক। চোখ দেখলে মনে হয় সেও কোন বিষণ্ণতায় ডুবে থাকতে ভালবাসে।

ইলিয়া এসে বলল, পুলক, ভেতরে এস।

পুলক ভিতরে ঢুকতেই দেখল কাঠের পাটাতন কি মসৃণ। এ-ঘরে একটা কালো রঙের কার্পেট, দেওয়ালের নিচটা কালো রঙের, ওপরে মেজেন্টা রঙের। দেয়ালে সারি সারি ফটো এবং উত্তরের দেয়ালে একটা তৈলচিত্র। ইলিয়া ছবিগুলো দেখাচ্ছিল এবং ওদের জন্ম-সাল, মৃত্যু-সাল সম্পর্কে নানারকমের কথা বলছিল।

এখান থেকে ইলিয়াকে দেখা যায়। পুলক একবার এই রোগ সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইলে ইলিয়া হাত তুলে ঠোঁটে ইসারা করল। বলল, তুমি কিছু বল না। এ-অসুখের কথা কিছু বলো না। এতে ব্রাউস আরও ঘাবড়ে যেতে পারে। ওর যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে আমরা তার সঙ্গে ব্যবহার করি।

অথবা পুলক যেন আরও প্রশ্ন করলে জানতে পারত, এই রোগ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের কম বৈঠক হয় নি। এমন কি সুদূর সাইন্টিফিক ইনস্টিটুট অফ ওকলাহামা অন মেডিসিন এই পারিবারিক রোগ সম্পর্কে রিসার্চ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। সুতরাং এই বংশ সবই ভবিতব্য ভেবে এখন ব্রাউসের মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে।

অথচ ব্রাউস কি সুন্দর। কি চোখ তার! হাত কি মসৃণ। এবং চুপচাপ থাকে বলেই শান্ত আর বড় স্থির মনে হয়। এভাবে বছর পার হয়ে যাবে। নতুন বছর আসবে, আপেলের বাগানে আবার লোকজন ফিরে আসবে। নতুন পাতা গজাবে গাছে গাছে, কি বিচিত্র বর্ণের সব ফুল ফুটবে পাহাড়ী সব উপত্যকায় এবং ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উপত্যকার ওপর উড়ে উড়ে সমুদ্রের সব ছোট ছোট দ্বীপে হারিয়ে যাবে। ব্রাউস জানালায় বসে সব দেখবে। উপত্যকার ও-পাশে সূর্য ওঠা দেখবে। সূর্যাস্ত দেখবে সমুদ্রে। সমুদ্র-পাখিদের কলরব শুনতে শুনতে ব্রাউস কেমন নিজের মনের ভিতর ডুবে যাবে। মায়ের মৃত্যুর দিন মনে পড়বে ব্রাউসের। মাও ঠিক এমনি এক জানালায় বসে থাকতেন। সারাদিন তার মুখে অদ্ভুত এক অলৌকিক প্রচ্ছন্ন হাসি ভেসে থাকত ঠোঁটে। যেন এই যে পৃথিবী দেখছ, বড় অনিত্য এবং এই যে গাছ এবং এই যে গাছ ফুল পাখি দেখছ বড় কাব্যময় অথচ সবই কত কম সময়ে পৃথিবী থেকে ফুরিয়ে যাবে। এবং এইভাবে দেখতে দেখতে ব্রাউসের মনে হত মায়ের মৃত্যু দিনটি। মা চুপচাপ শুয়ে আছেন যেন। সাদা কাপড়ে

ঢাকা মুখ। পা দুটো দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য রকমের সাদা মনে হয়। সেও মায়ের মতো শুয়ে থাকবে। পা দুটো আশ্চর্য রকমের সাদা দেখাবে।

আর তখন পুলক পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকল, ব্রাউন!

ব্রাউন তাকাল না। সে যেমন চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে সমুদ্র অথবা বালিয়াড়ি দেখছিল, তেমনি অপলকে দেখছে।

সে বলল, তুমি কি দেখছ বালিয়াড়িতে?

ব্রাউন চুপচাপ। নিঃশব্দ।

সে বলল, তুমি কখনও দূর সমুদ্রে গেছ?

ব্রাউন হাতটা এনে এবার কোলের কাছে রাখল।

সে বলল, জান ব্রাউন, আমরা পৃথিবীর সব সমুদ্র দেখেছি।

ব্রাউন নিজের হাত দেখল এবার। যেন বিরক্ত হচ্ছে পুলকের কথায়।

সে আবার বলল, ব্রাউন, একটা অদ্ভুত পাথরের মূর্তি আছে তোমাদের এখানে?

ব্রাউন নিজের ফ্রকটা টেনে দিল। ফুল ফল আঁকা ফ্রক। ইলিয়া ওকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। ডানদিকের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। ইমাছল্লা এবং মিলান বারান্দায় বসে থাকতে পারেনি। কাঁচে মোড়া বারান্দা এবং চারপাশটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। ঠাণ্ডা হাওয়া এতটুকু ঢুকতে পারছে না। ঘরে ঘরে ফায়ার প্লেস। আজ সব কটা ফায়ার প্লেসেই আগুন দেওয়া হয়েছে। লোকজন আরও আসবে। ইলিয়া কিচেনে এখন কি সব করছে। টিন ফুড খোলাখুলি হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে ডুনেদিন থেকে এসেছে ব্রাউনের পিসি। সে এখন ইলিয়াকে কিচেনে সাহায্য করছে।

পুলক ব্রাউনের পাশে এবার একটা চেয়ার টেনে বসল। সে বলল, জান ব্রাউন, আমাদের দেশটা ঠিক তোমাদের উল্টো। এখন তোমাদের শীতকাল। আর আমাদের দেশে এখন গ্রীষ্ম অথবা

বর্ষাকাল। পুলকের ভাল লাগছে কথা বলতে। কারণ এই মাত্র ব্রাউস ওর দিকে একবারের জন্য চোখ তুলে তাকিয়েছে। এবং সেই অলৌকিক প্রচ্ছন্ন হাসি ঠোঁটে। সকলে যখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত, চিন্তান্বিত তখন ওর ঠোঁটে এই প্রচ্ছন্ন হাসি প্রায় জীবন সম্পর্কে হাসি ঠাট্টার অথবা তামাশার সামিল।

পুলক বলল, পিছনে যে পাহাড়টা আছে, ওর ওপাশে কি আছে? বন, মাঠ, না তৃণভূমি।

ব্রাউস এবার উঠে দাঁড়াল!

পুলক বলল, তুমি কি আমাকে বেহায়া ভাবছ!

ব্রাউস কেমন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

—তা না হলে উঠে যাচ্ছে কেন! আশ্চর্য ব্রাউস নিঃশব্দে ওর পাশে বসে পড়ল। আর আশ্চর্য পুলক এখন মেয়েটির সঙ্গে এত কথা বলছে কি করে! এত কথা তার বলতে ভাল লাগছে কেন! সে সহসা কি ভেবে—ইলিয়া যখন যাচ্ছিল, সে বলে ফেলল, ব্রাউস বড় ভাল মেয়ে। ওর কোন অসুখ নেই।

ইলিয়া এই আগন্তুকের কথা শুনে সামান্য না হেসে পারল না। পুলককে সে ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে গেল। যেখানে ইমাদুল্লা বসেছিল, সেখানে এসে সে ফিসফিস করে বলল, ওর অসুখের কথা ওর সামনে আবার বলছ কেন?

পুলক কেমন বিশ্বাস করতে পারছে না। এমন এক সরল তরুণী, শান্ত স্থির এবং ধীর মেয়ে চুপচাপ আছে বলেই একটা অসুখ হয়েছে ভাবতে হবে—এ কেমন কথা! সে কিছু কৌতুক জানত। কারণ সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে নন্দিনীর বাবার কাছে মানুষ হয়েছে। নন্দিনীর মা কোনদিন পুলককে ভাল চোখে দেখেনি। সে বড় অবহেলায় মানুষ হয়েছে। নন্দিনীই ওকে যা কিছু মর্যাদা দিয়েছিল এবং সে কত বড় কৌতুক জানে, বিয়ের সময় তা টের পাওয়া গেছে। অথবা যখন বাবা সম্বন্ধ দেখতে গেল পুলককে নিয়ে, পুলকের ব্যবহারে, সেই

এক কৌতুককর ব্যবহার যা দেখে নন্দিনীর শাশুড়ী পর্যন্ত হেসে ফেলেছিল। পুলক নানারকম কৌতুকে অথবা জাদুতে বরযাত্রীদের হাসাতে হাসাতে নিজের দুঃখ চেপে রেখেছিল। এখানেও সে এক সামান্য মানুষ, অসামান্য হাত পা ছুঁড়ে, নানারকমের জাদু দেখিয়ে একবার যদি মেয়েটাকে বালিয়াড়িতে টেনে নিয়ে যেতে পারত। সে বলল, ইমাদুল্লা চাচা ওর মায়ের কি রোগ হয়েছিল?

মিলান এখন কাছে নেই। সে বাজারে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ইমাদুল্লা এবং পুলক স্রেফ বাংলায় কথা বলছে। ইমাদুল্লা বলল, ওর মার বিষণ্ণতা দেখা দেয়, ক্রমে হাত পা শুকিয়ে আসে। এবং রাতে রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে।

—ওর বাবার সে অসুখ হতে পারে?

—ওর বাবার হবে না। কারণ ইলিয়ার বংশের সে কেউ নয়।

—তা হলে ত্রাউসের মামা অথবা ইলিয়ার বাবা, কাকা কিংবা তাদের ঠাকুর্দা এমন রোগে মরেছে।

—সবাই যে মরে তা ঠিক নয়। অধিকাংশ এ-ভাবে মারা যায়।

—কোন প্রি-কসান নেওয়া যায় না।

—ওদের হয়ে অনেক বিশেষজ্ঞরা ভাবছে।

—কেন এটা হয়?

—কি করে বলব। পাগলের বংশে কেউ না কেউ পাগল যেমন হয়, আমার মনে হয় এও তেমনি।

—ত্রাউসের কিন্তু চোখ মুখ বলছে সে ভাল আছে।

—তুমি ডাক্তারি করতে কবে শিখলে?

—আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না ত্রাউস মরে যাবে।

—বিশ্বাস না হলে, থেকে যাও। চোখের ওপর দেখতে পাবে কি ভাবে মরে যাচ্ছে ত্রাউস।

—ঠাট্টা রাখ চাচা। পুলক কেমন শক্ত গলায় কথাটা বলে ফেলল।

কিন্তু ইমাহুল্লা ওর এই ধমকে কান দিল না। সে হা হা করে হেসে পরিবেশটাকে একটু হালকা করতে চাইল। তা না হলে কি করে প্রমাণ পাবে যে ব্রাউসের অসুখ হয়েছে।

পুলক আর কথা বলতে পারল না। সে কাঁচের জানালায় মুখ রাখল। দূরে সমুদ্রের প্রবল ঢেউ বালিয়াড়িতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ওর ভিতরটা কেন জানি হু হু করে উঠল।

সে বলল, কি করে ভাল করা যায় ?

—কেউ যদি ওকে সরল কথায় আবার জীবনের ভিতর ফিরিয়ে আনতে পারে।

—তার মানে ?

—তার মানে, যতদিন আছে বেঁচে থাক ভালভাবে। হাসো গাও, ছুটে বেড়াও। সমুদ্র দেখলে জলে ঝাঁপিয়ে পড় এবং সাঁতার কেটে নীল আকাশের নিচে ঝিনুকের মুক্তো খোঁজো।

—ঠিক করে বুঝিয়ে বল।

—জীবনের বড় কাজ হচ্ছে মুক্তো খোঁজা। সেটা পেতেও পার আবার সারা জীবন খোঁজা বৃথাও হতে পারে। অথচ এই খোঁজার ভিতর একটা বাঁচার রহস্য আছে। ব্রাউসের কাছে সে রহস্যটা মরে গেছে।

—কেন এমন হয় ?

—কোনো না কোনো ভাবে সে জেনেছে—এটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এর থেকে ওর নিস্তার নেই। ওর মা গেছে, মায়ের মাসি গেছে। দাদু গেছে—ঠিক এই একটা রোগে। তবে রোগটার আক্রমণ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপর বেশি। এ পরিবারের মেয়েদের সেজন্য সহজে কেউ বিয়ে করতে চায় না। যৌবন ভালভাবে আসতে না আসতেই ওরা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ইমাহুল্লা একটু থেমে বলল, এটা বংশগত রোগ। এই এক মেলাঙকোলিয়া, কি যে ভীষণ মেলাঙ-

কোলিয়ায় এদের পরিবারের কোন কোন মানুষকে পেয়ে বসে ভাবা যায় না।

এমন সময় ব্রাউসের বাবা ফিরে এল। সঙ্গে যেন কেউ আছে। বোধহয় ওর লাইট হাউসের কোন কর্মী। ওরা এসেই মুরগি নামিয়ে দিল চার পাঁচটা। সব ছোলা মুরগি। বড় বড়। ছোলা বলে মুরগি না টার্কি বোঝা যায় না দূর থেকে। কাছে এলে ইমাহুল্লা বুঝতে পারল, ওগুলো মুরগি। সে নিজে উঠে গিয়ে ওদের কাজে হাত লাগাল। এবং এ ভাবে কত সহজে আপন হওয়া যায়। ইমাহুল্লা বেশ নিজের মানুষের মতো—আজ ওদের ভোজের নিমন্ত্রণে দেখা শোনা করতে লাগল, পুলক একা একা কি ভাবতে ভাবতে ওদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল বার বার ব্রাউসের কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু সে এ-সময় কেন জানি বেশি সময় ব্রাউসের কাছে বসে থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয় এমন ভাবল। কেউ কিছু মনে করতে পারে। একমাত্র ইমাহুল্লাই জানে এ-পরিবার সম্পর্কে। সে গত সফরে অনেকদিন ব্রাউসের বাবার সঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে। ওদের একটা খামার বাড়ি আছে—সেখানে নানা রকম পশু পালন হয়, নানা রকমের ফলের গাছ আছে, আর বড় বড় পুকুরে নানা রকমের লিলি ফুল ফুটে থাকে। ইমাহুল্লা এত বড় খামার দেখে লোভে কিছুদিন জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে থেকে গেল। এবং প্রায় এই পরিবারের আত্মীয়ের মতো হয়ে গেল। সুতরাং সে, কি রান্না হচ্ছে, বাড়ির পেছনে যে সব পারসিমন গাছ ছিল তার সুমিষ্ট গন্ধ কেমন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, সে যে একটা গাভীর বাচ্চা হতে দেখে গিয়েছিল এবং বাচ্চাটার নাম, সে তার দেশের একটা নদীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেই গাভী এখন কোথায়, কটা তার বাচ্চা, কত পরিমাণ দুধ দেয়, না কি কিলখানাতে তারা ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে—কারণ এতদিনের সেই বাচ্চা গাভী হয়ে প্রায় বুড়ো হতে চলল—সে বোধহয় এখন বাড়ির

পিছনে দাঁড়িয়ে ব্রাউসের বাবার কাছে সে-সব খবরও নিচ্ছে। আর এ-সময়েই ভেড়ার মাংস রোস্ট হচ্ছে সে বুঝতে পারছে। কারণ এই রোস্টের গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সে এবার পিছনের দিকে তাকাল। দেখল তেমনি স্থির এবং অচঞ্চল ব্রাউস। ব্রাউসকে কেন যে সঙ্গে করে গতরাতে জাহাজে নিয়ে গিয়েছিল ইলিয়া সে বুঝতে পারল না।

আর তখন ইলিয়া বারান্দায় এসে এমন ঠাণ্ডায় ওভার কোটের পকেটে হাত রেখে সদরে পুলককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝল, পুলক এখানে হোমলি ফিল করছে না। ইলিয়ার এটা ভাল লাগল না। সে সাধারণত অতিথি অভ্যাগতদের জন্য নানা রকম ইনডোর গেমের ব্যবস্থা করে রাখে। যেমন ইমাহুল্লা খেয়ে-দেয়ে তাস খেলতে বসবে। যাদের তাস অথবা দাবা পছন্দ নয়, তাদের জন্য নানা রকমের লাল নীল রাবারের রিঙ। এবং ছোট্ট একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড। স্ট্যাণ্ডে যে যতবার রিঙ গলাতে পারবে ততবার সে একটা করে পেনি পাবে। আর পেনিগুলো পর পর সাজানো থাকে। ওপরের পেনি থেকে নিতে হবে। যদি পেনিতে ষষ্ঠ জর্জের মাথা থাকে তবে সে আরও দশটা পেনি পাবে, যদি পেনিতে আবু পাহাড়ের ছবি থাকে তবে তাকে দশটা পেনি ঘুরিয়ে দিতে হবে। এই এক খেলায় বেশ মজা আছে। সমুদ্র থেকে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবে। গাছগুলোর শাখা প্রশাখা দুলবে। শীতের সূর্য উঠতে উঠতে আকাশের অন্য প্রান্তে হারিয়ে যাবে। মেয়ে এবং ছেলেদের, এই যারা সদ্য যুবক হচ্ছে অথবা যুবতী হবে তাদের কাছে খেলাটা খুব প্রিয়। কিন্তু এখানে পুলকের সমবয়সী কেউ নেই। ব্রাউস আছে। সে তো চুপচাপ থাকে। পুলক ইচ্ছা করলে ব্রাউসের সঙ্গে গল্প করতে পারে। ব্রাউস যে একেবারে কথা বলে না, এখনও তেমন হয় নি। সময় সময় ব্রাউস হাসে পর্যন্ত। সেটা মুহূর্তের জন্য। এবং ইলিয়া যেমন ব্রাউসকে পারিবারিক উৎসবে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে তেমনি পুলককে

ব্রাউসের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলে ব্রাউস সামান্য সময় হয়তো মনে মনে খুশী থাকবে। তাছাড়া আর কি করা! ব্রাউসের এই ব্যবহারে কোনো বন্ধু বান্ধব নেই। কার দায় পড়েছে একা একা নিশিদিন বক বক করে যাবে। ব্রাউস কোনো কথা বলতে চাইবে না। ওরা মাঝে মাঝে ব্রাউসকে নিয়ে সুদূর তৃণাঞ্চলে চলে যায়। সেখানে সব সুন্দর সুন্দর পাখি দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উড়ে আসে ডিম পাড়বে বলে। তৃণভূমির পাশে পাশে ঘর বাঁধে। ব্রাউসকে একবার সেই সব পাখির ডিম অন্বেষণে তারা নিয়ে গিয়েছিল। আর যাবতীয় উৎসবে, মেলায়, জাদুঘরে এবং কার্নিভেলে ইলিয়া এই ব্রাউসকে নিয়ে ঘুরেছে। কিন্তু ব্রাউস যে কে সেই! সে এবার পুলকের সামনে এসে দাঁড়াতেই পুলক সামান্য স্বভাবসুলভ হাসি হাসল।

—তুমি ভিতরে এসে বস। এই ঝড়ো হাওয়া ভাল না। তোমার ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

পুলক ইলিয়ার সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

—তুমি যদি কিছু মনে না কর—বলে ইলিয়া পুলকের মুখের দিকে তাকাল।

পুলক আর হাঁটল না। সে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

—তুমি যদি ব্রাউসের সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে—

পুলক কি বলবে ভেবে পেল না। সে আবার চুপচাপ ওভার কোটের কলার টেনে হাঁটতে থাকল।

—জানি তোমার একা বক বক করতে ভাল লাগবে না।

—না না, ভাল লাগবে। সে সহসা কেমন চিৎকার করে কথাটা বলল।

—আমাদের কথা পুলক ফুরিয়ে গেছে! যা যা দেখেছি, যা যা জানি জীবন সম্পর্কে, সব ওকে বলে দেখেছি, সে আগের মতোই আছে। তুমি জাহাজী মানুষ। কত দেশ এবং মানুষের গল্প তুমি

জান। যদি এ-সব বলে সামান্য সময় ওকে অন্যমনস্ক রাখতে পার। যতটা সময় পারবে, ততটা সময় সে বাঁচবে, বলে ইলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যি সে জাহাজী মানুষ। পাঁচ বছরে সে বিচিত্র দ্বীপ, পাহাড়, সমুদ্র এবং বিভিন্ন বন্দর দেখেছে। বিচিত্র দেশের নরনারী দেখেছে। তাদের কাম ভালবাসা প্রেম দেখেছে। কোনো শুষ্ক মরুভূমিতে একটা অদ্ভুত ফার্ন গাছ দেখছে। এবং সেখানে হলুদ রঙের ফুল দেখেছে। সেই ক্যাকটাস জাতীয় গাছে বিরল হলুদ রঙের ফুলের মতো এই ত্রাউস। সেই ফুল চুপচাপ পৃথিবী থেকে ঝরে যাবে—তার স্বাদ আহ্লাদ কেউ চেটেপুটে খাবে না—ভাবতেই ওর কেন জানি নন্দিনীর মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে। এখন সেই পৃথিবীতে নন্দিনী তার স্বামীকে জানালার পাশে দাঁড় করিয়ে নিশ্চয়ই চুমু খাচ্ছে।

পুলক ধীরে ধীরে ত্রাউসের পাশে বসার সময় বলল, মাদাম ইলিয়া, একটা কথা বললে কিছু মনে করবেন না!

—না।

—ত্রাউসকে ফাদার কখন বাইবেল শোনাতে আসেন।

—সন্ধ্যার সময়।

—সময়টা একটু পাল্টানো যায় না।

—কেন বলত!

—এই সব কিছু একটু বদলে দেখুন না। আমি ভেবেছি আজ সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে বেলাভূমিতে একটু বসব।

—সে তো হবে না।

—পুলক কেমন যেন বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভাবল। সে আর কিছু বলছে না দেখে ইলিয়া এবার বলল, বিকালে তুমি আর ত্রাউস বালিয়াড়িতে গিয়ে বসতে পার। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

পুলক বলল, একটা কথা বললে আপনি কিছু মনে করবেন না?

—কি কথা। বলে ইলিয়া ময়দার হাতটা খুঁটতে থাকল।

—আপনি লণ্ঠন নিয়ে গিয়েছিলেন জাহাজে। ত্রাউস কি ভয় পায়, সামান্য অন্ধকারকে ভয় পায়?

আবার ইলিয়া ওকে চোখে ইসারা করল। যেন বলার ইচ্ছা এখানে এসব কথা নয়। দক্ষিণের দিকের ঘরটায় এস, সব বলি।

এখানেই আপত্তি পুলকের। সব কিছু বদলে না দিতে পারলে হবে না। আর পুলকের কেমন জিদ এসে গেল। সে যেন যাবতীয় দুঃখ এই মেয়ের সারিয়ে তুলবে। কেন এমন হয় মানুষের, মাঝে মাঝে একটা ইচ্ছা হয় পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ মুছে দিতে, সে ত্রাউসের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ত্রাউস কিন্তু আমার কথা শুনে একবার হেসেছিল মাদাম।

পুলক এত বেশি ভালমানুষ যে ইলিয়া ওর এমন কথা শুনে না হেসে থাকতে পারল না। সামান্য একটু হেসেছে বলেই গোটা মেলাঙকোলিয়া ওর সেরে যাবে—আবার হাসি খুশি, ঠিক সেই বছর দুই আগের ত্রাউস হয়ে যাবে এমন ভাবছে পুলক! সে বলল, তুমি এস। জাহাজ থেকে সময় পেলেই এস। যতক্ষণ খুশি গল্প করবে ত্রাউসের সঙ্গে। মনে মনে বলল, আমি ত্রাউসের সেই হাসিটুকু লুকিয়ে দেখেছি। দীর্ঘদিন ত্রাউস যেন এ-ভাবে হাসে নি। তোমার চোখে চোখ রাখলে সে যদি হাসে, সে যদি স্বাভাবিক হয়, তুমি ভারতবর্ষের মানুষ, জাদুকরের দেশ ওটা, যদি কোনো অলৌকিক ক্রিয়ায় তুমি ওকে ভাল করতে পার···যেমন মানুষ সমুদ্রে ডুবে গেলে কুটোগাছটি ধরার জন্য ব্যাকুল হয়, এই ঝড়ের দরিয়াতে ইলিয়া তেমনি আকুল। সে বলল, আমি যাচ্ছি পুলক। ত্রাউস, এ-আমাদের আপনার লোক। তোমার পূর্ব পুরুষরা সবাই ভারতবর্ষে ছিলেন। ভারতবর্ষের মাটিতে তারা এখনও আছে। সে দেশ থেকে এই মানুষ সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে এসেছে। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

পুলক এখন ত্রাউসকে দেখছে না। বৃদ্ধার ছলছল ছুটো চোখ দেখে মনে মনে কেমন সে নিজেই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধার সেই লণ্ঠন হাতে ডেকের ওপর মুখখানা ওর চোখে ভেসে উঠল। লণ্ঠন হাতে তিনি গিয়েছিলেন ত্রাউস ভয় পায় বলে। সামান্য অন্ধকারে পড়ে গেলেই ত্রাউস চিৎকার করে ওঠে। অন্ধকারটাকে মনে হয় ত্রাউসের মৃত্যু। সে জন্য সব সময় চারপাশে নানারকমের বাতি জ্বালানো থাকে এ-বাড়ির চারপাশে।

রাতে সে বুঝতে পারল, এ-বাড়ির যেদিকে তাকানো যায় সর্বত্র নানা রঙের আলোর ডুম জ্বলছে। ইলিয়ার পৈতৃক সম্পত্তি প্রচুর। সে সব বিক্রি করে এখানে একটা বড় খামার করেছে। হাজার পাঁচেক ভেড়ার একটা পাল আছে। কয়েক হাজার বিঘা ওদের তৃণভূমি আছে। সব আয় যেন এখন এই মেয়েকে রক্ষা করার জন্য। কেবল আলো আর আলো। যে এত আলো ভালবাসে, যার এত আলোর সখ সে কেন অন্ধকারের ভয়ে মরে যাবে?

রাতের বেলা সে জাহাজে ফিরে যাবার আগে ত্রাউসের কাছে গিয়ে বলল, আমরা যাচ্ছি ত্রাউস। কাল বিকেলে আবার আসব। ত্রাউস মাথা নিচু করে রেখেছিল। সে পুলককে মুখ না তুলেই বলল, তোমার সমুদ্রে কোনো সোনালী দ্বীপ নেই!

—আছে। কিন্তু আর কোনো কথা নেই ত্রাউসের মুখে। ত্রাউসকে চুপচাপ দেখে পুলকই বলল—তুমি সে দ্বীপে যাবে নাকি?

ত্রাউস আর জবাব দিল না। পুলক বার বার চেষ্টা করল জবাব পেতে কিন্তু কিছুতেই কোনো জবাব পেল না। যেন চাঁদ মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়ে আবার আকাশের ভিতর ডুব দিয়েছে।

চার

জাহাজে ফিরে যখন পুলক নিজের ফোকশালে ফিরে যাচ্ছিল, যখন জাহাজে প্রায় সকলেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে—ইমাতুল্লা দরজার তালা খুলছে তখন মনে হল কেউ তাকে ডাকছে। পুলক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ইমাতুল্লা তালা খুলতে খুলতে ওকে ডাকছে। এতক্ষণ ওরা দুজন একসঙ্গে ছিল, ওরা শেষ বাসে ফিরে এসেছে। নানা রকমের কথা হয়েছে দুজনের ভিতর, তারপরও কি কথা থাকতে পারে ভেবে পেল না। সে সিঁড়ি ভেঙে ইমাতুল্লার দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ইমাতুল্লা প্রশ্ন করল, কি খুব ঘুম পেয়েছে?

পুলক বলল, তা পেয়েছে।

—তবে যাও। কাল বলব।

—খুব জরুরী কিছু বলবে?

—না। জরুরী তেমন কথা কিছু নয়।

—তবে?

—যাওনা এখন। কাল বলব।

—এখন শুনে গেলে তোমার আপত্তি আছে চাচা?

—আপত্তি থাকবে কেন? তবে বোস। আমি ওপর থেকে আসছি। বলে ইমাতুল্লা শরীর থেকে ওভার কোট এবং মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে বাংকে ফেলে দিল। তারপর গট গট করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। মানুষটা যে বুড়ো হয়েছে চলায় বলায় কিছুতেই তা ধরতে দেবে না। একেবারে তাজা মানুষের মতো সব সময় ব্যবহার।

পুলক আকাশ পাতাল ভাবছিল। এমন কি জরুরী কথা যা বলতে বেশ সময় নেবে। কারণ এখন ইমাতুল্লা বাথরুমে গেছে। সে নিচ থেকেই তা টের পেয়েছে। দরজার খুটখাট শব্দ হচ্ছিল।

ঝড়ো হাওয়া যে ক্রমে বাড়ছে বোঝা যাচ্ছিল। সে চুপচাপ পোর্ট হোলে মুখ রেখে বসে দেখল, ইমাহুল্লা দরজা ঠেলে ঢুকছে। তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে বলছে, ব্রাউস তোমার সঙ্গে কথা বলেছে?

—বলেছে।

—কি বলেছে?

—বলেছে সমুদ্রে কোথায় সোনালী দ্বীপ আছে?

—কথাটা শুনে তুমি কি ভেবেছ।

—কি আবার ভাবব। একটা কথা বলেই ও চুপচাপ। বললাম, ব্রাউস তুমি যাবে সোনালী দ্বীপে, আমি নিয়ে যাব।

—তুমি খুব বোকা আছ। তুমি ওর কথা থেকে বুঝি ভেবেছ সে সোনালী দ্বীপে যেতে চায়।

—আমার কিন্তু তাই মনে হয়েছে।

—যদি নিয়ে যেতে পার ভাল।

—কিন্তু তুমি আমাকে ডাকলে কেন? কি বলবে বলছিলে?

—ইলিয়া বলেছে, ব্রাউস তোমার সঙ্গে কথা বলছিল। কি কথা বলেছে তারা শুনতে পায় নি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, কি এমন কথা বলেছে।

—ও, এজন্য ডেকেছিলে!

—হুঁ। তবে ওরা তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল।

পুলক হাঁ করে তাকিয়ে আছে ইমাহুল্লার দিকে। সে একটু বেশি খেয়েছে আজ। রাতে সামান্য ককটেল ছিল। পুলক এসব পান করে না। ওর অভ্যাস নেই। শীতের জন্য মাঝে মাঝে সে যেটুকু খায় তা প্রায় ওষুধের মতো। সুতরাং ওরা যখন ককটেল পার্টিতে মত্ত ছিল, তখন পুলক কাঁচের জানালায় ব্রাউসের সামনে বসে ওর সুন্দর চোখের মণিকোঠায় অথবা হৃদয়ের গভীরে কি ব্যঞ্জনা আছে ধরার চেষ্টা করছিল।

ইমাতুল্লা দেখল, পুলক ওর সম্পর্কে ইলিয়া অথবা মিলান কি জানতে চাইছে তার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ করছে না। সুতরাং সে নিজেই বলতে থাকল—বললাম খুব ভাল ছেলে। বন্দর এলে জাহাজীদের যে একটা দুরারোগ্য ব্যাধি থাকে সেটা ওর একেবারেই নেই। খুব শান্ত প্রকৃতির ছেলে।

—আর কিছু বল নি!

—বলেছি, বন্দর এলেই সে বিকালে বাসে শহরের চারপাশটা দেখে বেড়ায়। রবিবার অথবা কোনো ছুটির দিন পেলে সে বাসে করে দূরে দূরে চলে যায়। বন অরণ্য এবং নির্জন উপত্যকায় সে চুপচাপ বসে থাকতে ভালবাসে।

—বাবা! তুমি দেখছি চাচা আমাকে একজন কবি করে ফেলবে। ওরা বলল না, ছোঁড়াটার মাথায় কবিতার বাতিক আছে কিনা!

—তা বলে নি। তবে আমিই বলেছি, সে জাহাজে বসে পালিয়ে পালিয়ে কবিতা লেখে!

—এ্যাঁ! তুমি বলছ কি, আমি কবে কবিতা লিখলাম?

—মিথ্যা বলছ কেন পুলক? আমি সব জানি। তোমার অসুখের সময় তোমার সুটকেশ খুলে কিছু টাকা বের করে দিতে হয়েছিল। তুমি তখন বাংক থেকে উঠতে পর্যন্ত পারতে না। আমি সব দেখেছি।

পুলক বলল, কি করব চাচা, একঘেয়ে এই জাহাজ একেবারে ভাল লাগে না। তাই পালিয়ে পালিয়ে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

—এ সবের জন্য আমি তোমায় ডাকি নি। আমার কথা শুনে ওদের তোমার ওপর অদ্ভুত একটা বিশ্বাস এসে গেছে। ছুটি হলে তুমি ওখানে চলে যেও। ত্রাউসের সঙ্গে গল্প করলে ইলিয়া এবং ত্রাউসের বাবা খুশী হবে।

পুলক ইমাতুল্লার ঘর থেকে বের হয়ে এল। দু পাশেই ফোকশাল। মাঝখানে সিঁড়ি নেমে এসেছে টুইন ডেক থেকে। এবং একটা

সিঁড়ি আপার ডেক পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন ওর ঘুম আসবে না। প্রচণ্ড শীতে শরীর কাঁপছে। নতুবা ওর এখন চুপচাপ বাংকে শুয়ে না থেকে রেলিঙে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড় এবং বাতিঘরের আলো দেখার ইচ্ছা। কিন্তু প্রবল ঠাণ্ডার জন্য তার আর ওপরে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে নিজের ফোকশালে নেমে গেল। সেখানে ডান দিকের বাংকে গঙ্গা, নিচে সূর্য এবং ওপরের বাংকে সে থাকে। এই শীতে এখন কম্বলের নিচে ঢুকে যেতে পারলে বড় মনোরম। অথচ কেন জানি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নন্দিনীকে আজ একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

পাঁচ বছর আগে নন্দিনীর (ঠিক বিয়ের পর পরই) স্বামী একটা চিঠি দিয়েছিল পুলককে। চিঠিটা ওদের হানিমুনের চিঠি। সে লিখেছিল, দাদা, হানিমুনটা যে কোথায় করি, একবার ভেবেছি পুরীতে চলে যাব। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে আমি আর নন্দিনী। নন্দিনীর ইচ্ছা সে খুব ছুটবে বালিয়াড়িতে। আমি তার পিছু নেব। নন্দিনী যখন ছুটে ছুটে আর পারবে না, খপ করে ওর আঁচলটা ধরে ফেলব এবং সে বালিয়াড়িতে পড়ে যাবে—কি মজাটাই না হবে।

অবশ্য আমার ইচ্ছা কোনো পাহাড়ে যাই। দূরে, যে সব পাহাড়ে নির্জন কোনো কুঠিবাড়ি আছে এবং নানারকমের গাছপালা আছে, কাঁচের ঘর আছে আর নানারকমের ক্যাকটাস আছে, সারাদিন আমি এবং নন্দিনী খুশি মতো কেবল গাছপালার ভিতর ছুটব।

পুলক অবশ্য এই ছোটার ভিতর নন্দিনীর 'উলঙ্গ' শরীর প্রত্যক্ষ করত। যেন তার ভালবাসার পোষা পাখিকে শিকারী বেড়াল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সে তখন আর স্থির থাকতে পারত না। নন্দিনী, নন্দিনী বিয়ের পর আমি কেমন আছি একটা চিঠি দিয়ে জানলে না।

নন্দিনীর বর অবশ্য আরও কিছু লিখেছিল। হানিমুনের জন্য ওর কোনো সোনালী যব অথবা গম খেতের কথাও মনে হয়েছে।

কোনো সমতলভূমিতে কোনো পাহাড়ী উপত্যকাতে, যেখানে যব গম হয়, যেখানে চাষী মানুষেরা পরিশ্রম শেষে ঘরে ফিরে আসে, কুপি জ্বেলে বউএর মুখ দেখে এবং ছোট্ট নদীতে কোনো নৌকা গেলে তার যে গান দূর থেকে ভেসে আসে তেমন এক নীরব নিভৃত পল্লীতে সে নন্দিনীকে নিয়ে হানিমুনের জন্য জায়গা নির্বাচন করতে চায়।

চিঠি পাওয়ার পর পুলক দুদিন ঘুমোতে পারে নি। সে ছটফট করেছে। সে যে কত মহিমান্বিত জীবন নিয়ে বেঁচে আছে তা দেখাবার জন্যই যেন চিঠির জবাব দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। চিঠিতে সে নন্দিনীর কথা দায় সারা ভাবে লিখেছিল। আশা করি নন্দিনী ভাল আছে।

অথচ সে চিঠিতে সে যে কিছু লিখতে চেয়েছিল কিন্তু কি যেন এক অভিমান ওকে নিয়ত কুরে কুরে খেয়েছে যার জন্য যেন-তেন প্রকারে চিঠির জবাব দেওয়া এবং নন্দিনী প্রায় সমবয়সী, কিছু সে বড়, এই বছর দুই বয়সের বড় হবে। নন্দিনীর কোনো ভাই-বোন নেই। সংসারে এই আত্মীয়টিই ওর যা কিছু আবদারের অংশীদার ছিল। সে কত কিছু লিখতে পারত, নতুন জীবন কেমন লাগছে, ওর কথা সুসময়ে মনে হয় কিনা···কিন্তু সে কিছু লেখে নি। কেবল লিখেছে, যেখানেই যাবেন হানিমুনে নন্দিনীর শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

তারপরই সে কেমন উদাসীন হয়ে গেল। মাঝে মাঝে কোনো রেল স্টেশনে দাঁড়ালে মনে হত, নন্দিনী একা চলে আসবে, দরজায় সে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং পুলককে দেখলেই ছুটে এসে বলবে, তুমি কেন এমনভাবে ছেড়ে দিলে আমাকে, আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি চলে এসেছি পালিয়ে।

কত রাত সে না ঘুমিয়ে জানালায় বসে রয়েছে। যেন দূরের মাঠে কেউ তার জন্য ছুটে আসবে। এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলবে, তোমার মতো নিষ্ঠুর মানুষ বাপু আমি দেখি নি। তুমি কি করে

আমাকে না দেখে আছ! আমিও পারলাম না বাপু। চলে এলাম পালিয়ে।

এ-ভাবে কতদিন, কতরাত বিনিদ্র কাটলে ওর কবিতা লিখতে ইচ্ছা হত। কত কাল সে একা জানালায় বসে কাটিয়ে দিয়েছে, সে বৃষ্টির রাতে হাতে জল ধরত। এবং কল্পনায় সেই ঠাণ্ডা জল দুহাতে মেখে দিত নন্দিনীর গালে। মনে হত খুব ঝড় উঠেছে। আকাশ কালো মেঘে উথাল পাতাল করছে। সে এবং নন্দিনী একটা ফাঁকা মাঠে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়ের দাপটে নন্দিনীর চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে। এবং পুলকের কোঁচা লুটিয়ে পড়তে পড়তে ঝড় আবার তুলে নিচ্ছে ওপরে। ঘন ঝাপসা মতো আধা আলো অন্ধকারে ওরা প্রবল বর্ষণে ভিজে ভিজে মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোনো কোনো দিন, চুপচাপ বসে থাকলে জানলায় রাখা মাথাটা কেমন ফাঁকা মনে হত ওর। অসহ্য লাগত সব কিছু। এবং সে ছটফট করত ভিতরে ভিতরে। ছুটে যাবার ইচ্ছা হত। ওকে জোর করে ধরে নিয়ে কি যেন করার ইচ্ছা হত। নন্দিনীর বর ওর চেয়ে কত বড়। প্রায় দশ বছরের। নন্দিনীর বর তবু পুলককে দাদা বলে ডাকে। পুলক এসব ভেবে একদিন হা হা করে হেসেছিল জানালায় বসে। নন্দিনী কোনোদিন আর তার মেসবাড়িতে দেখা করতে এল না।

তারপর তার এই নিরুদ্দেশে চলে আসা। জাহাজে জাহাজে কাজ। তার যা বিদ্যা সে জাহাজে মোটামুটি একটা কেরানীর চাকরি পেতে পারত। কিন্তু কেন জানি সেই যে অভিমান নিয়ে সে জাহাজের জাহাজী হয়ে বের হয়ে এল এবং আর তার যেন কোনো ব্যাপারেই মোহ নেই। এবং নন্দিনীকে ফের দেখা হলে সে যা যা বলত, এখন ঠিক সে সবই সে এই সব দূরের বন্দরে সমুদ্রের কোনো নির্জন দ্বীপে, চিনার গাছের জঙ্গলে এবং কোনো নীল উপত্যকায় লিখে রাখে। লিখে রাখতে রাখতে মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য নন্দিনী ওর শুষে নিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম মনে হল ব্রাউন আর

এক মেয়ের নাম, যে আজ হোক কাল হোক মরে যাবে, যে সমুদ্রের সোনালী দ্বীপ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে কারণ সবারই জীবনে একটা সোনালী দ্বীপ চাই, সেটার জন্য সবাই ছুটে মরছে। নন্দিনী কি তার সোনালী দ্বীপ আবিষ্কার করে ফেলেছে। চিঠি লিখে এসব জেনে নেবে এমন ভাবল। সে সেজন্যই আর শুতে গেল না। নিচের বাংকটা খালি। এখানে সবাই কাজের ফাঁকে বিশ্রামের জন্য এসে বসে। একটা পুরানো ম্যাট্রেস পাতা আছে। সে ওপরের আলোটা জ্বেলে রাখল না। ঘুম ভেঙে গেলে সবাই চেঁচামেচি করবে। সেজন্য সে নিচের আলোটা জ্বেলে হাতের দস্তানা খুলে লকার থেকে কাগজ এবং কলম বের করে লিখতে বসে প্রথমেই লিখল,

সুচরিতাসু,

তোমাকে সহসা একটা চিঠি লিখে ফেলছি। তুমি কেমন আছো জানি না। এ চিঠি পেয়ে তুমি কি ভাববে তাও জানি না। তবু আমাকে কেন জানি লিখতে হচ্ছে। অনেক কথা লিখব বলে বসেছি। তুমি সব কথা মনে করে রেখছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি একা এবং সমুদ্রের মতো আমি নিঃসঙ্গ বলে সব মনে করে রেখেছি। তুমি হয়তো ভুলে গেছ সব।

এইটুকু লিখেই সে কেমন আর লেখার কিছু পাচ্ছে না। কেন জানি ওর মনে হচ্ছে নন্দিনী এখন একা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনের মাঠ ফাঁকা। মাঠে কত সবুজ গাছপালা ছিল, নিমেষে সব মুছে গিয়ে রুক্ষ মাঠ চোখের ওপর ভেসে উঠেছে।

তা হলে কি নন্দিনীর কাছে এখন আর কোনো জীবনের রহস্য বলে পদার্থ নেই। পাঁচ বছরে ওর মানুষটি ওর সব চুরি করে নিয়েছে। ওর যা কিছু ছিল, গর্ব করার মতো যা কিছু ছিল, সব ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে! সে হাই তুলল এবার। কাল খুব সকালে উঠতে হবে। সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলল। এবং পোর্টহোলে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

পাঁচ

আজ ঝড়ো হাওয়াটা তেমন নেই। সকাল থেকেই ডেকের জাহাজীরা বোট ডেকে উঠে গেছে। ডেক-টিণ্ডালে ব্রীজের ছাদে উঠে সি-ওয়াটার ভালবগুলো খুলে দিচ্ছে। নিচে হোস পাইপে জল মারছে জাহাজীরা। আকাশ পরিচ্ছন্ন। এখনও সূর্য ওঠে নি। আটটা বেজে গেছে। সূর্য উঠতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে যাবে। ওদের ওয়াচ সাতটা থেকে। তখন ডেকে যথেষ্ট অন্ধকার থাকে। তখনও মনে হয় রাত আছে এবং নীল লাল আলো বন্দরের চারপাশে জ্বলতে থাকে। এবং এই ঠাণ্ডায় যারা বন্দরে কাজ করতে আসে তারা কেউ কেউ শুকনো ডাল, অথবা ঘাস পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে রাখে ক্রেনের নিচে। পুলক রেলিঙে দাঁড়িয়ে সেই আগুনের ভিতর ব্রাউসের মুখ যেন দেখতে পেল।

গতকাল সে গিয়েছিল ব্রাউসের বাড়িতে। ওর বাবা বাড়ি ছিল না। ওর ঠাকুমা একটা ছোট মোয়ার দিয়ে সামনের লনে ঘাস ছেঁটে দিচ্ছিল। একটা বেতের চেয়ারে ব্রাউস বসেছিল। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে। ওকে দেখেই ইলিয়া ছুটে এসেছিল। এবং ভিতরে নিয়ে বসাতে চাইলে ও বলেছিল, এই তো বেশ। আপনি একটু বিশ্রাম নিন। মোয়ার দিয়ে আমি ঘাস কেটে দিচ্ছি।

ইলিয়া বলেছিল, তা কি করে হয়?

—কেন হবে না!

—তুমি বরং ব্রাউসের সঙ্গে গল্প কর। আমি তোমার জন্যে কফি করে আনছি।

—না মাদাম ইলিয়া। আমি এলে, আপনি যদি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন তবে আর আসব না। বলে সে আর দেরি করে নি।

মোয়ারটা টেনে টেনে এক কোনায় নিয়ে গিয়েছিল। এবং চাকা গুলো অ্যাডজাস্ট করে সে এমন নিখুঁতভাবে ঘাস কেটেছিল যে ইলিয়া দেখে অবাক।

ইলিয়ার হাতে কোনো কাজ থাকে না বিকেলে। সে তার বাগানে পড়ে থাকে। বাগানের মাঝখানে ব্রাউস স্থির অপলক বসে আছে। প্রায় দেবীর মতো চোখ মুখ তার। বিষণ্ণ প্রতিমা এই ব্রাউস। এবং যারাই গাড়িতে অথবা বাসে এসে এখানে নেমে যায়, দেখতে পায় এক বৃদ্ধা এক সুন্দরী কিশোরীকে বসিয়ে রেখেছে গোলাপের বাগানে এবং নিজে কখনও গাছের পাতা ছেঁটে দিচ্ছে, কখনও কথা বলছে ব্রাউসের সঙ্গে।

—আচ্ছা ব্রাউস, এই গোলাপটা কত ইঞ্চি হবে বলত? এটার রঙ কালো হল কেন! এই যে লাল রঙের গোলাপ এটাকে বলে, এডিনবরার গোলাপ। তোমার দাদু আনিয়েছিলেন। কি সুন্দর?

কখনও পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে—কি, এখন কি গাছগুলোর ডাল ছেঁটে দেওয়ার সময় হল? এই তো শীতকাল এসে গেল। এখন বরং গোড়ায় কিছু এমনিয়া দিয়ে দি। কি বলিস ব্রাউস?

ইলিয়া কাজ করছিল আর অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল। সে যখন ঘরে থাকে, তখনও সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞেস করে যাবে, কিরে ব্রাউস এখন কি এই নীল রঙের পর্দা মানাবে? আমি বলছিলাম এখন তো বসন্তকাল এসে যাচ্ছে, হলুদ রঙের পর্দা করে দিলে কেমন হয়? তোর কি মত? তা হলে দিতে বলছিস! যখন সব কিছুই ভবিতব্যের সামিল তখন সে ব্রাউসের সঙ্গে তুই-তুকারি করে। আবার যখন মনে হয়, না বেঁচে যাবে, ভবিতব্য বলে কিছু নেই, চেষ্টা, মানুষের অনন্ত চেষ্টায় কিনা হয় তখন ইলিয়া বলবে, ব্রাউস এবার আমরা, পামার হিলসের জলপ্রপাতের পাশেই যে সুন্দর ঘাসের ঘর আছে, তোমার জন্যে তার ঘর ভাড়া করব।

কিন্তু ব্রাউসের কোনো সাড়া থাকে না। সে যেমন চুপচাপ বসে থাকে তেমন চুপচাপই বসে থাকে, যেন সে দূরের সমুদ্র গর্জন শুনতে পাচ্ছে। ব্রাউস আশ্চর্য রকমের তখন নীল হয়ে যায়।

পুলক সারাটা বিকাল কাজ করেছে বাগানে। ইলিয়া ঘরে কফি করেছে। দু টুকরো মটন স্যাণ্ডউইচ এবং একটু পনিরের সঙ্গে গাজর সিদ্ধ করে এনে দিয়েছে পুলককে। কি সুন্দর সুন্দর সারি সারি গোলাপের গাছ। লনের চারিদিকটা গোলাপের কেয়ারি করা বাগানগুলো থেকে এবার সব পাতা ঝরে যাবে। ফুল ফুটবে না। বরফ পড়ার আগে যেন ইলিয়া দুহাতে এইসব গাছগুলোকে পরিচর্যা করছে। কারণ যখন বরফ পড়তে শুরু করবে, তখন এইসব গাছগুলো বরফের গাছ হয়ে যাবে। আশ্চর্য রকমের সাদা হয়ে যাবে চারপাশটা। কাঁচের জানালায় বরফ পড়ে নকশি কাঁথার মাঠ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে সেখানে ব্রাউস তার সরু সুন্দর আঙুলে দাগ কেটে কেটে বুঝি লিখবে, আগামী বসন্তে আমি মরে যাব পুলক।

গত বিকেলে সে নানাভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিছুক্ষণ সামনা-সামনি দুজন বসেছিল। গরম জ্যাকেট গায়ে ব্রাউসের। হাতে সবুজ রঙের দস্তানা এবং সাদা রঙের ফ্রকে একটা পাখি। গাছটার কোনো পাতা নেই। অথচ পাখিটা গাছে বসে রয়েছে।

পুলক গাছ পাখি, ফ্রকের সাদা রঙ, হাতের দস্তানা এবং বিষণ্ন মুখ দেখে বলেছিল, ব্রাউস, তুমি বলেছিলে সোনালী দ্বীপে যাবে। সেটা কবে যেতে চাও, আমি নিয়ে যাব। অথবা সেই সব কৌতুক এখন এখানে করা চলে কিনা! সে ভাঁড় সাজবে। এবং যেমন একজন কমেডিয়ান সকল দর্শককে হাসায়, সে তেমনি কোনো হাসির গল্প বলে হাসাবে। হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে কিনা দেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল পুলক এবং মাই লেডি বলে কিছু বলতেই ব্রাউস বলেছিল, পুলক তুমি বোস। তুমি দাঁড়িয়ে হাত পা নাড়লে আমার ভয় করে।

পুলক বলেছিল, আমার সঙ্গে তবে এস। আমি হাত পা নাড়ব না। আমরা বালিয়াড়িতে গিয়ে বসব। তোমাকে পেনির খেলা দেখাব।

—আমার ভাল লাগে না কিছু।

—কেন ভাল লাগে না।

—জানি না। আমার কিছু ভাল লাগে না।

পুলকের সঙ্গে এত কথা বলছে, এমন সব কথা একেবারে আপনার জন যেন এই পুলক, সে বলল, তুমি কখনও কোনো সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে গেছ ব্রাউস ?

—কি করে যাব বল।

—আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে তেমন এক দ্বীপে চলে যাই। নানা রকমের রঙিন গাছপালা রোপণ করব। যেখানে যত ছোট ছোট রবিন পাখি আছে—অথবা মুনিয়া—সব ছেড়ে দেব আকাশে।

পুলক খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছে এখন। যেন সে নাবিক নয়। এক বালক, সরল বালক—সে যে কিভাবে আরম্ভ করবে কথা, এবং কি কি কথায় ব্রাউস আনন্দ পাবে, ওর ভিতরে যে গ্লানি দেখা দিয়েছে সেটা সরে যাবে—এমন কি কথা আছে, পৃথিবীতে এমন কি রহস্য আছে জীবনে বেঁচে থাকার, যা এই মেয়ের প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে।

তখন ব্রাউস বলল, বরফ পড়লেই বাবা আমাকে লাইট হাউসে নিয়ে যাবে। ঠাকুমাকে নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু তিনি যাবেন না। তারপরই মনে হল কি দেখে, অঃ ইলিয়া চলে আসছে, যেন ইলিয়াকে দেখে ফের গম্ভীর হয়ে গেল ব্রাউস্।

আহা নিমেষের জন্য পুলক দেখেছিল একেবারে স্বাভাবিক মুখ। সে বলল, ব্রাউস। তারপর কি বল! আমি তোমার কথা সব শুনব।

পুলক এমন আগ্রহভরে তাকিয়েছিল যে ব্রাউস বলল, পুলক, আমার কিছু ভাল লাগে না। আমি মরে যাব ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

—কেন তুমি মরে যাবে!

—কেন যে মরে যাব জানি না।

—তোমার কি কষ্ট ব্রাউস?

আমার কি কষ্ট! আমার কষ্ট এই যে সুন্দর সব ফুলের গাছ, বরফ পড়লেই তারা সব ঝরে যেতে থাকবে। কিছুই গাছে থাকে না। সব ঝরে যায়। আমার বড় কষ্ট হয় পুলক। কোনো কষ্টের ছবি দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। শরীর আমার ঠাণ্ডা হয়ে আসে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, যেমন আমার মা ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমে মরে গেলেন।

—এটা তোমার অহেতুক ভয় ব্রাউস।

—তুমি পুলক দেখছি ডাক্তারের মতো কথা বলছ।

—না না আমি ডাক্তার নই। আমি সামান্য জাহাজী।

—ডাক্তারের কাছে গেলেই বলবে এটা তোমার মনের রোগ ব্রাউস। আমার মনের রোগ তো, আমার মামারা, মা এবং দিদিমার বোন, তার মা সবাই এ-ভাবে মরে গেল কেন পুলক?

পুলক এ-কথার জবাব দিতে পারছিল না। সে চুপ করে ছিল।

সন্ধ্যা নামার আগেই সব আলোগুলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। সে কেন জানি ভাবল, ব্রাউসকে একবার কোনো অন্ধকারের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে। অন্ধকারকে ওর বড় ভয়। সে অন্ধকারে গেলেই অযথা সারাক্ষণ চিৎকার করে। আমি মরে যাব, তোমরা কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে! আমি বাড়ি যাব।

শুধু ব্রাউস কেন, ওর মা এবং ওদের যার যার এমন একটা রোগ দেখা দেয় তাদের জন্য অন্ধকার বড় ভয়াবহ।

ইলিয়া একসময় ফাঁক বুঝে কাছে এসে বলেছিল, পুলক, ব্রাউস আজ আমার কাছে খাবার চেয়ে খেয়েছে। পুলক, তারপরই আবার সেই ব্রাউস। ওর মার মতো জানালায় বসে যেন সমুদ্র গর্জন

শুনছে। তুমি যতদিন এ বন্দরে আছো একবার অন্তত এসো। ইমাহুল্লাকে আসতে বলো।

সে বলেছিল, বলব মাদাম ইলিয়া। আমি নিশ্চয়ই আসব।

সে নিশ্চয়ই আর যাবে কি, যেন এই যাওয়া এখন আর ওর হাতে নেই। যে কোনো কারণেই হোক ব্রাউস ওর কথায় কেমন সাড়া দিচ্ছে। আর সেও কোনোদিন জীবনে এমন বাহবা অথবা সে যে একবার এক দূরবর্তী ভালবাসার ভিতর আচ্ছন্ন ছিল, ক্রমে যেন এই ব্রাউস তা কেড়ে নিচ্ছে। সে চিঠি লিখতে পারে নি। সে এখন কতক্ষণে বারটা বাজবে, কতক্ষণে ছুটো খেয়ে জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে চলে যাবে কিনারায় সেই আশায় আছে।

গতকালও সে হাফ ছুটি নিয়েছিল। ইমাহুল্লাকে সারেঙ ভয় পায়। সে ইমাহুল্লাকে দিয়ে ছুটি করিয়ে নিয়েছে। সারেঙ এখন কাজের চাপ কম বলে, ওকে ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ এখন এ অঞ্চলে ছুটো না বাজতেই সূর্য হেলে যায়। চারটা না বাজতেই রাত। সে যে কি করে ওকে নিয়ে যাবে সেই দ্বীপে, যেখানে সেই এক পাহাড় মাথা উঁচু করে একেবারে মানবী সেজে সমস্ত আকাশে তুরে ফুঁরে ভালবাসার ছবি এঁকে দিচ্ছে—সে যে কি করে নিয়ে যাবে তাকে সেই ভালবাসার দ্বীপে। কোথায় স্কীপ পাওয়া যাবে এখন। ইমাহুল্লা চাচা সব জানে। সে হাঁটতে থাকল ডেক ধরে। ওর কাজ এনজিনে। তেলের ট্যাঙ্কগুলো পরিষ্কার করতে হবে। সে দাঁড়িয়ে থেকে করাবে। যারা কাজ করবে—ট্যাঙ্কের ভিতর নেমে যাবে, তারা সকলেই চলে গেছে বোটডেকের ওপর। সেও সেখানে যাচ্ছে। যাবার আগে একবার ইমাহুল্লার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত।

ভাল মন্দ যাই হোক এমনই মানুষের স্বভাব, কিশোরী মেয়ে মরে যাচ্ছে শুনে, আর যে এমন সুন্দর এবং সজীব, তার কেন যে সহসা হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, আর মরে যাব মরে যাব করে, সে ভেবে পায় না, সে মনুষ্য বলে তার কাছে মনে হয় এক অতীব শক্তি আছে,

আর যখন তার কেউ নেই, তার যে ভালবাসার জন সেও পাঁচ বছর আগে ওর চেয়ে দশ বছরের বড় মানুষের হাত ধরে চলে গেল—কি খুশী কি খুশী সে। একটা চিঠি পর্যন্ত দিয়ে এখন জিজ্ঞাসা করে না, তুমি কেমন আছো ?

আমি ভাল আছি নন্দিনী। আমি এখন এই জাহাজে রয়েছি। আমার এখন যেন প্রাণপণ লড়ে যাওয়া, সেই যে মেয়েটা মরে যাবে বলে বসে আছে তার ভিতর প্রাণ সঞ্চার করা। ইমাহুল্লা চাচার কাছে ওরা জেনেছে, আমি বড় ভালমানুষ। ওদের বিশ্বাস দেখে আমার আরও ভাল হতে ইচ্ছা করছে।

তুমি বলবে, পুলক তুমি কি বোকা, কি বোকা! আমি বলব, এই যে পাশে সমুদ্র রয়েছে, সামনে দ্বীপ রয়েছে, ওপরে আকাশ রয়েছে আর ক্রেন পার হলে বন্দর রয়েছে সব মিলে এখন আমি, আমার আমি। আমার আমিকে কখনও এত বড় মনে হয় নি! ভিতরে আমার একটা জিদ জন্মে গেছে, জিদ না বলে প্রত্যয়ই বলা ভাল। ব্রাউসের কোনো রোগ নেই। ওদের ওটা ভালবাসার রোগ। এ বয়সে এমন একটা রোগ সহজেই হতে পারে।

তুমি বলবে, কি বোকা, কি বোকা, কি বোকা পুলক! বিজ্ঞানের যখন এমন জয়যাত্রা, চাঁদে মানুষ যাচ্ছে তখন তুমি এক হাতুড়ে বৈদ্য, মনের কথা কিবা জানো। তুমি বললে কিনা, এটা বয়সে হয়, বয়সের রোগ। এবং বাপু আমি তো কোথাও শুনি নি এ রোগে মানুষ মরে যায়। আমিও মরে যাই নি। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে আসার পর কতদিন আর কথা বলতে পারি নি। আমিও জানালায় কেমন কিছুদিন পাগলের মতো বসেছিলাম। এখন সে সব মনে হলে বড় হাসি পায়। আর শেষে নন্দিনী হাসতে হাসতে যেন বলছে, বিজ্ঞান যেখানে লড়তে পারল না, তুমি তো ফুঁ। বস্তুত তুমি ব্রাউসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছ পুলক। জাহাজে তুমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না। সে তোমাকে কেবল টানছে।

দিনটা বেশ উজ্জ্বল ছিল। রোদ উঠছে সকাল থেকেই। এ সময় রোদ থাকার কথা নয়। ঝড় বৃষ্টি অথবা তুষারপাত হবার কথা। অথচ এখনও তুষারপাত হচ্ছে না। কনকনে ঠাণ্ডা ডেকের ওপর। সারাটা দিন হিমেল হাওয়া বইবে। সূর্য সব সময় দিগন্ত রেখায় থাকছে। ছায়া বড় লম্বা হয়ে পড়ছে। এবং দিন বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পুলক ইমাহুল্লার কাছ থেকেই কোথায় স্কীপ ভাড়া পাওয়া যেতে পারে জেনে নিল। সে চাচাকে বলল, তুমি যাবে? তুমি গেলে বড় ভাল হয়।

ইমাহুল্লা বলেছিল, কেন তোর ভয় হয়!

—ভয়, না। তবে!

—তবে কি?

—এতদূরে যাব!

—দূর কোথায়? তুই যদি পাল তুলে দিস তবে ঘণ্টা দেড়েকের পথ, আর যদি মোটর বোটে যাস, তবে আরও কম সময়। যাবি আর আসবি।

পুলক বলেছিল, ভেবেছিলাম একাই যাব।

—একা গেলে তুমি চিনে নাও যেতে পার।

—এজন্য সঙ্গে ত্রাউসকে নিচ্ছি।

—ত্রাউস তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে!

—যাবে বলছে।

—বলছ কি! ত্রাউস কথা বলছে তোমার সঙ্গে!

—খুব। কেবল কথা আর কথা। আমরা একবার ওদের বাড়ির পেছনে যে পাহাড়টা আছে সেখানে গেছিলাম। সে আমার সঙ্গে ছুটে ছুটে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল।

—খুব গুল ছাড়ছ।

—ঠিক আছে তুমি চলো একদিন। কবে যাবে বল।

—ইমাহুল্লা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ওদের সেই পুরোহিত মানুষটি আসছে।

—আসছে। তবে সন্ধ্যায় নয়। সকালে। ব্রাউস এখন সে সব শুনতে চাইছে না। সে বিকাল হলেই ছটফট করতে থাকে। সদরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি কখন যাব সেই প্রতীক্ষায়।

—বলছিস কি! এ যে একেবারে জাহুর সামিল।

—বোধহয় তাই।

—কি করে হল?

—কি করে হল জানি না চাচা, তবে প্রত্যেক দিন আমি ওকে ওদের যে সব জায়গা দেখার মতো সেখানে নিয়ে গেছি। ওদের গাড়িতে গেছি। নানা রকমের গল্প বলেছি। আমাদের দেশের বর্ষাকালের কথা বলেছি। নদী নালার গল্প বলেছি, আমি যে একটি মেয়েকে ভালবাসতাম এবং সে যে বিয়ের পর আমার আর কোনো খোঁজ নেয় না সব খুলে বলেছি। সব সময় কিছু বলে যাওয়া। সে শুনুক আর নাই শুনুক, দুহাতে তালি বাজানো। সে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলে, কোনো কোরি পাইনের ছায়ায় আমি হাত ধরে বলেছি, ব্রাউস তুমি কি সুন্দর। পৃথিবীর কত বন্দরে গেছি, কত সমুদ্র পার হয়ে গেছি কিন্তু কোনোদিন তোমার মতো এমন সুন্দর মেয়ে কোথাও দেখি নি।

অথবা কখনও চাচা আমি আর ব্রাউস উইলো ঝোপে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। সে আর আমি পাশাপাশি। মনেই হয় নি আমি এ বন্দরে জাহাজী হয়ে এসেছি। আবার চলে যাব। কেবল ওর চোখের দিকে তাকালে আমার কেন জানি মনে হয়েছে, ওর ভিতর আবার প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। সে ভাল হয়ে যাবে।

ইমাহুল্লা বলল, সে তো ভাল হয়ে গেছে দেখছি।

—না, ভাল হয়ে যায় নি।

—সব স্বাভাবিক, ভাল হয়ে যায় নি মানে!

—একটু চুপ করে থাকলেই, ওর আবার কেন জানি মৃত্যু ভয়টা এসে তাকে গ্রাস করে। সে চিৎকার করতে থাকে তখন, পুলক আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমি মরে যাব। তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল। আমি ওকে সন্ধ্যার আগে যে ভাবেই হোক বাড়ি পৌঁছে দিতাম। সে জানালার কাছে বসত। কিছুতেই আর কথা বলতে চাইত না।

ইমাহুল্লা বলল, তবে তোর মনে হয় একেবারে সেরে ওঠে নি।

—মনে হয় আদৌ সারে নি।

—ইলিয়া কি বলছে।

—তুমি আসার পর ওকে খুব খুশী খুশী দেখছি।

—আর কি বলছে?

—তুমি চলে গেলেই জানি সে যেমন ছিল তেমনি হয়ে যাবে।

—ইমাহুল্লা বলল, তবে আর ওকে নিয়ে যাবি কি করতে। বরং তুই একা চলে যা। সারেঙ খুব রাগারাগি করছে। তুই কাজ-ফাজ না করে যাস, সারেঙ চেল্লাচেল্লি করছে।

পুলক কথা বলল না। পরে সে বলল, আজ যাব। আর যাচ্ছি না।

পুলক বারোটা না বাজতেই এনজিন রুম থেকে চলে এল। সাধারণত জাহাজ বন্দরে এলে হাতে কাজের চাপ কম থাকে। সে তার করণীয় কাজটুকু খুব তাড়াতাড়ি খেটে খুটে করে নিল। বাথরুমে স্নান করল গরম জলে। সে চন্দন সাবান গায়ে মেখেছে। সে সুন্দর সাদা রঙের শার্ট, কালো রঙের টাই এবং ব্লু নেভি সার্জের সুট পরেছে। সে মাথায় ফেল্ট ক্যাপ পরেছে। ওভার কোট কাঁধে ফেলে যেন কাপ্তান অথবা মেজ মিস্ত্রি দেখতে না পায় প্রায় পালিয়ে পালিয়ে সে বন্দরে নেমে এসেছে।

তাড়াতাড়ির মাথায় সে ভালভাবে খেতে পারে নি পর্যন্ত।

ব্রাউসকে নিয়ে সে সেই দ্বীপে দিনমানে যাবে এবং দিনমানে ফিরে আসবে। সন্ধ্যা হলেই, অন্ধকার নামলেই চিৎকার করবে ব্রাউস। সে অন্ধকারকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। অন্ধকারই মৃত্যুর আর এক রূপ এমন হয়তো সে ভেবে থাকে।

ব্রাউসের বাড়ি যেতে গেলে দেরি হবে। সেজন্য ঠিক ছিল ব্রাউসের বাবা গাড়ি করে আসবে। ব্রাউস যে ক'দিন আনন্দে থাকে থাকুক। আর এই মেয়েকে বিয়ে করবে কে! এখন অবশ্য ব্রাউসের বাবা মনে করতে পারে না, ব্রাউসের মা কি আগেই অসুখে ভুগছিল! সব লুকিয়ে ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে ভেবেছিল, যদি সে নতুন জীবন পেয়ে সেরে ওঠে। এমন দেখা গেছে অবশ্য কেউ হয়তো অসুখের আক্রমণের মুখে, বিয়ে-থা দিলে ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত হতে হতে অসুখের কথা ভুলে গেছে। ব্রাউসের বাবা অবশ্য এখন মনে করতে পারে না কিছু। যতদূর মনে আসে, ব্রাউস পেটে আসার পরই তার স্ত্রী কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। এবং ভয়, মৃত্যু ভয়, শরীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, যেটা ওরা ক্রমে শুনে আসছে পারিবারিক ভাবে। এবং বর্তমানে এভাবে উত্তর পুরুষদের অবশ্য নানা রকম সতর্কতার ভিতর রাখা হয়, এত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদি মন দুর্বল হয়, যা মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব প্রযোজ্য, মেয়েরা এভাবে মরে যায়। বেশী বয়সে জানলে খুব একটা ভয় থাকে না। ইলিয়া এই পারিবারিক দুর্ভাগ্যের খবর বেশি বয়সে পেয়েছিল।

সুতরাং ব্রাউসের বাবাই গাড়ি চালিয়ে চলে আসবে। পিকাকোরা পার্কে যাবার পথে ওরা একটা কাফেতে বসে থাকবে। কফি খাবে। এবং সময় দেওয়া আছে, ঠিক সময় মতো পুলক চলে যাবে। মেয়েটা যে ক'দিন এই ভারতীয় জাহাজীর সঙ্গে হাসে গায়, যে ক'দিন সামান্য হাসি খুশী থাকে, সে ক'দিনই ওর কাছে উপরি পাওনা। কেউ তো বড় আসে না এ পরিবারে। রোগটা সংক্রামক কিনা কে জানে! যার জন্য প্রায় একটা লোকালয় বিহীন জায়গায় ইলিয়া বাড়িটা নির্মাণ করেছে।

পুলক বাস থেকে পার্কের পাশে নামল। সেখান থেকে ওকে সামান্য সময় হাঁটতে হবে। এখন ঘড়িতে একটা বাজতে দশ মিনিট। সূর্য এখন দক্ষিণ দিগন্ত রেখায়। বেশ নরম আলো। ঠাণ্ডা এবং কনকনে হাওয়া বলে সে টাইটা আরও এঁটে নিল গলায়। জ্যাকেট সে গায়ে দিয়েছে, নিচে। এবং ইচ্ছা হল এ সময়ে জোর হাঁটে। জোরে হাঁটলে ঠাণ্ডা ভাবটা বেশি সময় থাকে না। সে জোরে হেঁটে যেখানে সমুদ্র একটা ছোট্ট লেগুন সৃষ্টি করেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। নানা রঙের স্কীপ। লাল হলুদ রঙের। সাদা রঙের স্কীপ বাঁধা সিঁড়িটার পাশে। বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলে স্কীপ। দু' পাড়ে পাব, কাফে এবং কার্নিভেল। প্রতি শনিবার এখানে কার্নিভেল বসে। সে ডানদিকের কাফে থেকে ত্রাউসের সাড়া পেল। একটা বড় নীল রঙের ছাতার নিচে সে এবং তার বাবা বসে রয়েছে। সামনে সমুদ্র। দুপাশে কিছু ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। ছোট ছোট কাঠের ঘর লাল নীল রঙের। কাঁচে মোড়া দরজা জানালা। ভিতরের মানুষগুলো পানাহার করছে বোঝা যাচ্ছে।

ত্রাউস বলল, কি এত দেরি কেন ?

—দেরি কোথায় ? বলে সে ঘড়ি দেখল।

ত্রাউসের বাবা বলল, কি বলব ? কি খাবে ?

—এখন কিছু খাব না।

—তা কি করে হয়। তোমার জন্য আমরা বসে আছি। এখানে সবাই খেয়ে নেব।

এমনই একটা কথা ছিল। অথচ পুলক সেটা বেমালুম ভুলে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খেয়েছে বলে, ভাল করে পেট ভরে খেতে পায় নি। সে যে খেয়ে এসেছে সে কিছুতেই বলল না। সে বলল, ঠিক আছে আপনাদের পছন্দ মতো বলুন।

—তা কি করে হয়। ত্রাউস বাধা দিল কথায়। এই ত্রাউসকে দেখলে কে বলবে, ত্রাউসের কিছু অ্যাবনরম্যাল ব্যাপার আছে। কি

খুশী আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দ্বীপগুলোতে যাবার জন্য এইসব স্কীপ। এবং দুপুরে বের হয়ে যাবে বলে অনেকেই এসেছে। ওরা সবাই এখন এইসব রেস্তরাঁতে খাবে এবং দ্বীপে বসে খাবার জন্যে কিছু টিফিন নেবে সঙ্গে। ত্রাউসের মুখ দেখে মনে হল, সেও কিছু নিয়ে নেবে। পুলক নিজের ব্যাগ থেকে খাবারের দাম দিতে চাইল। মিলান ভীষণ রাগ করে বলল, তুমি কি মনে কর আমি খুব গরীব।

পুলক আর কোনো কথা বলতে পারল না। সে কেমন আমতা-আমতা করতে থাকল। আর এই না দেখে ত্রাউস হা হা করে হেসে উঠল। মিলান মেয়ের এমন হাসি দেখে এই নাবিকের জন্য কেমন মমতা বোধ করল।

ওরা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। ত্রাউসের বাবা ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। ত্রাউসকে একটা সংক্ষিপ্ত পথের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে ওর বাবা। যাবার সময় কিছু খাবারও দিয়ে দিয়েছে। দ্বীপে বসে খাবে। পুলক মোটর বোট চালাতে পারে। সে হাল ধরে বসে থাকল। ওপরে ত্রাউসের বাবা হাত তুলে ওদের বিদায় জানাল।

পুলক এবং ত্রাউস লেগুন ধরে কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। দু'পাড়ে পাহাড়। পাহাড়ী পথ। খুব দ্রুত গতিতে স্কীপটা ছুটছে। দিগন্তে সূর্য বলে ওদের মুখে সূর্যের আলো পড়ছে না। ত্রাউসের মাথায় রুমাল বাঁধা। হাওয়ায় ত্রাউসের রুমাল উড়ছে এখন। সে একটা লাল প্লাস্টিকের বেল্ট এঁটে নিয়েছে মাথায়। ওর মুখটা ডিমের মতো দেখাচ্ছে।

ত্রাউস বলল, পাহাড়টার নাম কি জান?

পুলক বলল, তুমি আমার দিকে মুখ করে বসো ত্রাউস।

এ-পাহাড়টার নাম পিয়ারা পাহাড়। এখানে একরকমের গাছ পাওয়া যায় যার কোনো পাতা হয় না।

পুলক বলল, তুমি বলেছিলে আমি কোনো সোনালী দ্বীপ দেখেছি

কিনা ? তোমাকে সোনালী দ্বীপে নিয়ে যেতে পারি কিনা। এখন আমরা সেখানেই যাচ্ছি।

—যা সেটা সোনালী দ্বীপ হবে কেন। পুলক, তুমি ঠিক কথা বলছ না।

—আমরা যখন দ্বীপের পাশ দিয়ে আসছিলাম তখন কিন্তু দ্বীপের রঙটা হুবহু সোনালী ছিল।

—এখন তো শুধু ঝড়ো হাওয়া। এইটুকু বলার সময়ই ওদের স্কীপটা বাঁক নিল। এবং ওরা এসে সমুদ্রে পড়ল। ঝড়ো হাওয়া বলে বড় বড় ঢেউ উঠছে। ঢেউ কেটে স্কীপটা রাজহাঁসের মতো দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে।

ওরা পিছনে সামনে এখন এমন কত স্কীপ দেখছে। জোড়ায় জোড়ায় যুবক যুবতী দ্বীপগুলোর উদ্দেশে বের হয়ে পড়েছে। কারণ সময় শেষ হয়ে আসছে। জুলাইর মাঝামাঝি সময় আর আবহাওয়ায় এ-অবস্থা থাকবে না। তুষারপাত আরম্ভ হবে। পেঁজা তুলোর মতো তুষার উড়বে আকাশে। মনে হবে অজস্র কাশ ফুল যেন হাওয়ায় উড়ছে। তখন এই সব বাড়ি ঘর, গাছপালা সব তুষারে ঢেকে যাবে। সমুদ্রের জল বরফ হয়ে যাবে। সেই সব দ্বীপে পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেল চালিয়ে চলে যাওয়া যেতে পারে। তবে অনেকে যায় না। কারণ বিপদের আশঙ্কা থাকে। আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অনেকে ঘর থেকে বেরই হতে চায় না। প্রায় নির্বাসনে রয়েছে বন্দরটা এমন মনে হয় তখন।

ত্রাউস বলল, এখন ঝড়ো হাওয়া, এরপরই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামবে। সূর্য উঠবে না। এমন সুন্দর দিন আর পাবে না পুলক। আমি হয়তো আর কোনোদিন এমন সুন্দর দিন দেখতে পাব না। আগামী শীত আসতে না আসতে আমি মরে যেতে পারি।

পুলক এবার গম্ভীর গলায় ডাকল, ত্রাউস।

ত্রাউস চোখ তুলে তাকাল।

—তুমি এমন বললে আমি আর কোনোদিন তোমার কাছে যাব না।

—আর বলব না পুলক।

—কেন তোমার এসব মনে হয়।

—আমার এমন মনে হলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

—তুমি এই মনে হওয়াটাকে ভুলে যেতে পার না!

—পারি না। কিছুতেই পারি না। আমি লুকিয়ে আমাদের পরিবারের মৃত্যুর লিস্টটা দেখেছি। তাদের মৃত্যুর আগের ছবি দেখেছি। কি যে চেহারা হয়ে যায় তখন! একেবারে কঙ্কাল। কি কুৎসিত! ভাবতে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমিও মরার আগে দেখতে তেমন হয়ে যাব—বলে ত্রাউস কেমন বিষণ্ণ চোখে সমুদ্র দেখতে থাকল।

পুলক দেখল, বড় ঝামেলায় পড়া গেছে। সে ভেবেছিল অন্তত এই সুন্দর দিনে ত্রাউস সব ভুলে থাকবে। সে এবার বাধ্য হয়ে বলল, ত্রাউস, তোমাকে একটা কথা বলব?

—বল।

—রাগ করবে না।

—না।

—যদি এটাই ঠিক থাকে তুমি মরে যাবে, তুমি আর এই দ্বীপে আসতে পারবে না, তবে এই দিনটাকে ভাল করে দেখে নাও। তুমি কি সুন্দর ত্রাউস! কতবার এই এক কথা বলেছি, অথচ যখন বল, তুমি বাঁচবে না, আমার ভাল লাগে না। আমরা তো কেউই বাঁচব না। তুমি যদি দিন গুণে থাক, তবে আমি বছর গুণছি। ঠিক না—

ত্রাউস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—তবে—আমার কি উচিত এই ভেবে বিমর্ষ হয়ে থাকা?

ত্রাউস মাথা নেড়ে এবারেও সম্মতি জানাল।

—আজ অন্তত এমন সুন্দর দিনটা তুমি এসব ভেবে নষ্ট করে দিও না।

—নষ্ট করে দেব না।

—ঠিক বলছ তো ?

—ঠিক বলছি।

—আমার মাথায় হাত দিয়ে বলছ ?

ত্রাউস হেসে দিল, মাথায় হাত দিয়ে কেন ?

—মাথায় হাত রেখে কিছু বললে সেটা মানতে হয়। না মানলে আমার খারাপ হবে।

—তবে আমি তোমার মাথায় হাত রাখব না পুলক। আমি তো তখন আমার ভিতর থাকি না। এতে আমার নিজের কোনো হাত নেই পুলক। শুধু বলতে পারি, চেষ্টা করব।

মাথায় হাত রেখে ত্রাউস কথাটা বলল।

ত্রাউস এবার মুখোমুখি এসে বসল। মাথায় হাত রাখল পুলকের। ধীরে ধীরে বলল, আমি চেষ্টা করব পুলক। তারপর চোখ নিচে নামিয়ে বলল, সেটা আরও ধীরে এবং কোমল গলায়, তুমি আমায় এত ভালবাস পুলক ?

পুলক জবাবে কিছু বলল না। সে হাত তুলে দেখাল, ঐ ছাখো আমরা এসে গেছি। দ্বীপগুলো দেখে সে আনন্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাত

এটা সেই দ্বীপ। এর পাশ দিয়েই ওদের জাহাজ গিয়েছিল। এমন অনেক দ্বীপ এখানে ছত্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে। নানা রকম ওদের চেহারা। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য যে মাটি আছে তাতে সবুজ ঘাস। নানা রকম ঘাসের ফুল এবং ছোট ছোট ঝোপ আছে। জাহাজ থেকে শুধু পাথরের দ্বীপ বলেই মনে হয়েছে। চারপাশে সমুদ্র বড় বড় ঢেউয়ের ভিতর আছড়ে পড়ছে। এবং কোনো কোনো ঢেউ এমন উঁচু হয়ে আসছে যে জলটা সেই নারী মূর্তির পা ধুইয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

পুলক দ্বীপে নেমেই স্কীপটা টেনে ডাঙায় তুলে দিল। ওরা এখন সেই নারী মূর্তিটার দিকে হাঁটছে। পুলকের ইচ্ছা যদি এই মূর্তির গা বেয়ে ওপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য যত সে কাছে গেল তত দেখতে পেল, ঠিক যেন নারী মূর্তি পাথর, মসৃণ পাথর, পাহাড়ের চুড়োর মতো ক্রমে ওপরের দিকে উঠে গেছে। সে বলল, ব্রাউস এখনও একে আমি ঠিক কোনো ডিভাইন লেডি ভাবতে পারছি না। একে যদি দু' ডাল নিয়ে দুদিকে কোনো মৃত গাছ বলে ভাবি ক্ষতি কি! তুমি দ্যাখো ওকে ইচ্ছা করলে এমনও ভাবতে পারি।

ব্রাউস বলল, এসব বলার আগে আমাদের একটা ভাল জায়গা বেছে নিতে হবে। নতুবা পরে কিন্তু জায়গা পাবে না। নির্জন নিরিবিলি জায়গা।

পুলক বলল, তার মানে?

—দেখবে সবাই এসে জায়গা বেছে নিচ্ছে।

—কি রকম জায়গা!

—যেখান থেকে সমুদ্র ওরা দেখতে পাবে। পাশে ঢিবি থাকবে

একটা। ওরা পাশাপাশি শুয়ে থাকলে কেউ দেখতে পাবে না। বলেই ত্রাউস পুলকের দিকে তাকাল। ত্রাউসের মুখে কোনো রেখা ফুটে উঠছে না। অন্তত এমন কথায় পুলক ভেবেছিল, ত্রাউস নিশ্চয়ই ত্রাস করবে।

—আমাদের সে সবের কি দরকার আছে! আমরা কেবল দ্বীপটা ঘুরে দেখব।

—কিন্তু যখন পরিশ্রান্ত হবে, তখন। তখন নিরিবিলি বসে আমরা ওদের মতো একটু কথা বলব না ?

সে ঠিক কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য, পুলক ওর মুখে এমন কোনো রেখা ফুটে উঠতে দেখেছে না যা দেখলে ভাবা যায় ত্রাউস পুলককে নিয়ে ঠিক সব যুবক যুবতীরা যে জন্যে এখানে আসে তেমনি সেও এখানে সে জন্য চলে এসেছে। বরং ত্রাউসকে দেখলে মনে হয়, তার মনে কোনো পাপ নেই। সরল যুবতী, ঠিক যুবতী বলা যায় না ত্রাউসকে বরং তরুণী বলা ভাল, সব কিছু রহস্যময় হওয়ার কথা অথচ যার কাছে কোনো রহস্য এখন জেগে নেই। ওর ইচ্ছে মতো যদি কাজ হয়, সে এখন যা চাইছে তেমন যদি হয়, তবে হয়তো ওর মনে আবার বাঁচার ইচ্ছা জেগে উঠবে। সব কিছু ওর জন্য যে ঠিক হয়ে নেই, কোনো নির্ধারিত সময়ে যে ও মরে যাচ্ছে না এ-বোধ থেকে ওকে নিষ্কৃতি দিতে পারলে প্রায় এই দ্বীপের ভিতর ভালবাসার নিমিত্ত ঘুরে বেড়ানোর সামিল হবে। সে বলল, ঠিক আছে। চল। তুমি আর কবে এখানে এসেছিলে ?

—ঠাকুমার সঙ্গে এসেছি বার দুই। আমরা দ্বীপের এদিকটাতে আসি নি। শুনেছি এখানে এসেই একটা জায়গা বেছে না নিলে বসার ঠিক জায়গা পাওয়া যায় না। বলে সে একটা ছোট্ট বনঝোপ দেখতে পেল। এবং নিচে সমুদ্র। একটা পাহাড়ের খাঁজে জল একবারে টলটল করছে। ত্রাউস এখানে তার চুলের রিবন খুলে ছোট্ট ডালে বেঁধে রেখে বলল, চল এবার।

—তার মানে !

—এখানে এসে কেউ আর বসবে না। এই লাল রিবন দেখলেই বুঝতে পারবে, আজকের বিকেলের জন্য জায়গাটা দখল হয়ে আছে।

—যারা মাথায় রিবন বেঁধে আসে না।

—তারা কোট অথবা স্কার্ফ ফেলে রাখে। তারপর দ্বীপটা ঘুরে দেখে। এখন আমরাও দ্বীপটা ঘুরে দেখব।

ওরা যখন পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছিল অথবা ওরা যখন নানা রকম ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছে তখন আরও সব স্কীপ দ্বীপের পশ্চিম দিকটায় এসে লাগছে।

এটা এক আশ্চর্য দ্বীপ। এখন রোদ সোনালী রঙের। দ্বীপটা প্রায় সোনালী হয়ে গেছে।

পুলক দেখল ওরা যেদিন জাহাজে যাচ্ছিল ঠিক সেদিনের মতো আবহাওয়া। ত্রাউসকে সে বলল, এই তো তুমি সোনালী দ্বীপে এসে গেছ ত্রাউস। আচ্ছা ত্রাউস, দূর থেকে কিন্তু কিছুতেই বোঝা যায় না এটা নারী মূর্তি নয়। জলের নিচ থেকে একটা পাহাড় মাথা তুলে যে সূর্য ওঠা দেখছে কিছুতেই বোঝা যায় না।

ত্রাউস বলল, পুলক, এমন একটা দ্বীপে এসে তোমার কবিতা লিখতে ইচ্ছা করে না ?

পুলক জানে এটা ইমাহুল্লার কাজ। সে বলল, তোমাকে চাচা ঠাট্টা করে বলেছে।

—ঠাট্টা কি করে বলব। তুমি যেভাবে এমন একটা দ্বীপে আমাকে নিয়ে আসতে পারলে, আমার বাবা এসে তোমার স্কীপে আমাকে তুলে দিয়ে গেলেন ভাবতেই অবাক লাগে। এখন বলছ পাহাড়টা সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল। সূর্য ওঠা দেখবে বলে সেই যে জলের ওপর ভেসে উঠল আর ডুবতে পারল না। তুমি আমার বাবাকে, আমাকে, দিদিমাকে এ-ভাবেই মুগ্ধ করেছ পুলক।

পুলক হাত টেনে বলল, খুব দেওয়া হচ্ছে!

—দেওয়া কি আবার! যা সত্যি তাই বলছি!

—আমি কবিতা লিখি, কেন যে লিখি জানি না। এগুলো আদৌ কবিতা কিনা তাও জানি না। তোমাকে ইংরেজী করে কবিতার ভাবার্থ বলে দিতে পারি। তুমি বলতে পারবে এগুলো কবিতা হয়েছে কিনা।

—পুলক, তুমি আমাকে কবিতার মাস্টার ভাবলে শেষ পর্যন্ত!

—কেন ভাবতে অসুবিধা কি! তোমার এমন বয়স যে এ সময়েই তো কবিতার সঠিক মানে ধরা যায়। এমন একটা বয়সে কবিতা ভাল না লাগলে আর কি ভাল লাগবে। যদি যথার্থই কবিতা হয় তবে তোমার ভাল লাগবেই। বলে পুলক দ্বীপের ঝোপ জঙ্গল পার হয়ে প্রায় সমুদ্রের কিনারে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে ওরা উপকূল বরাবর দক্ষিণ দিকে লাইট-হাউস দেখতে পেল।

—ছুটি ফুরোলেই বাবার সঙ্গে আমি লাইট-হউসে ফিরে যাব।

—সেখানে তুমি সময় কাটাও কি করে।

—আমি এখন বাবার সঙ্গেই থাকি। দিদিমার কাছেও মাঝে মাঝে চলে আসি। আমার অসুখটা হওয়ার পর বাবা আর স্কুলে যেতে দেন না। বরফ পড়তে শুরু করলে বাবার সঙ্গেই থেকে যাব।

—তোমার তো বছর খানেকের ওপর হল এমন হয়েছে।

—তার আগে স্কুল ছুটি হলে যখন বাবার কাছে চলে যেতাম তখন বড় আমার আনন্দের দিন ছিল। বলে সে পুলকের দিকে তাকাল, চল এখানে না বসে আমাদের জায়গায় গিয়ে বসি। ওরা ফিরে যাবার সময় ব্রাউস বলল, যখন গ্রীষ্মকাল আসত, পাহাড়ের নিচে আমি ময়দার সঙ্গে ইস্ট মাখিয়ে খাঁজে রেখে আসতাম। বড় চিংড়ি মাছ এসে জমা হত। ছিপ ফেলে কত মাছ ধরতাম। কোনো কোনো বিকেলে ঘাসের ওপর বসে থাকলে দেখতে পেতাম ছোট বড় সব কচ্ছপেরা সমুদ্রের ওপর পিঠ ভাসিয়ে রাখছে। ওদের কোনো

ভয় ছিল না। কিছু শুশুক মাছ ভেসে আসত। ঝড়ো হাওয়া থাকলে সমুদ্র থেকে ঢেউয়ের সঙ্গে উড়োক্কো মাছ এসে দ্বীপের ঘাসের ভিতর রুপোর কাঠির মতো ছড়িয়ে থাকত। আমি কুড়িয়ে নিতাম।

ওরা এতক্ষণে ওদের সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে ফিরে এসেছে। ব্রাউস পুলককে দেখে বলল, সারাদিন জাহাজে কাজ করেছ। আবার এখানে এবং দ্বীপে ঘোরা, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি একটু শোবে। বলে সে লম্বা জ্যাকেট খুলে পাথরের ওপর বালিশের মতো করে বলল, তুমি একটু শোও, কি সুন্দর সমুদ্র। কি ঢেউ দ্যাখো। কেমন জলের ঝাপটা এসে নিচের পাহাড়ে ধাক্কা মারছে।

পুলক বলল, তোমার কোটটা নষ্ট হবে ব্রাউস। বরং এস তোমার সেই লাইট-হাউসের গল্প শুনি।

—কেন তোমার গল্প, সেই যে মেয়েটা তোমাকে ভালবাসত!

—মেয়েরা বড় সহজে সব ভুলে যায় ব্রাউস।

—না। ওরা সহজে ভোলে না। তুমি ওর ঠিকানা দিও। আমি একটা চিঠি দেব।

—সত্যি!

—কি লিখবে!

—লিখব একজন ভালবাসার মানুষ সারা পৃথিবীতে কেবল তোমার নাম লিখে বেড়াচ্ছে।

—ও কথা লিখতে যেও না। যদি ওর স্বামী জানতে পারেন তবে ওর পক্ষে অসম্মানের হবে। তুমি বরং লিখ তোমার দাদাটি বড় স্বার্থপর মানুষ। সে কারুর কথা বেশিদিন মনে রাখে না।

ব্রাউস এবার নিজেই পুলকের পাশে হাটু গেড়ে বসল। ওর মসৃণ ঘাড়ের অংশ এত সাদা এবং কোমল যে পুলক না তাকিয়ে পারল না। ওর সুন্দর স্তন ফ্রকের ওপর ভেসে রয়েছে। হাতে ওর সোনার আংটি। দামী পাথরের আংটিটা সোনালী রোদে চকচক করছে।

ব্রাউন বলল, এটা আমার মায়ের আংটি। দ্যাখো কি সুন্দর। বলে পুলকের কোলে সে হাতটা রাখল। হাতের আংটিটা ভাল করে দেখুক এমন যেন ওর ইচ্ছা।

পুলক দু' হাতে ওর হাতটা চোখের সামনে এনে বলল, ভারী সুন্দর তোমার আংটিটা।

ব্রাউন বলল, এখানে আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না পুলক।

—সমুদ্র দেখতে পাচ্ছে।

—আর ঐ দ্যাখো, বলেই পিছনের দিকে তাকাবার জন্য ব্রাউন পুলককে অনুরোধ করল।

আশ্চর্য ওরা দেখছে সেই নারী মূর্তি ওদের উপর যেন ঝুঁকে আছে। এখানে বসলে যে পেছনের পাহাড়ের আড়ালে সেই বিরাট মূর্তি উঁকি দিয়ে ওদের এই বসে থাকা দেখতে পাবে ওরা ভাবতেই পারে নি।

পুলক বলল, তোমাকে আমাকে পাহারা দিচ্ছে।

—পাহারা দেবার কি আছে আমাদের!

—কত কিছু আছে। তুমি জান সব ব্রাউন। জেনেও তুমি জানো না এমন মুখ করে রাখছ।

—আমি তো মরে যাব। এসব জেনে আর আমার কি হবে!

পুলক খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, তুমি কিন্তু ব্রাউন বলেছিলে, কিছুতেই আর এমন কথা বলবে না।

—আমার ভুল হয়ে গেছে পুলক।

পুলক আর কোনো কথা বলল না।

—আমার সত্যি ভুল হয়ে গেছে।

পুলক এখন সামনের সমুদ্র দেখছে। কিছু সমুদ্র পাখি ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। পুলক যেন সমুদ্র পাখি দেখছে।

—তোমার অমঙ্গল হবে পুলক। আমি যে কি করে ফেললাম।

পুলক আরও কেমন চোখ মুখ অসহায় করে রাখল।

—পুলক, এখন আমি কি করব। আমি কি করলে তোমার কিছু হবে না।

পুলক ওকে অন্যমনস্ক করার জন্যে বলল, ছাখো কত পাখি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

—তোমার মাথায় হাত রেখে আমি শপথ করেছিলাম, আমি এমন আর করব না।

পুলক ওর দিকে তাকাচ্ছে না। ব্রাউস পুলকের গালে হাত দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকল।

—পুলক বললে, আর বলো না। তবেই ঠিক হয়ে যাবে। ভুল তো মানুষেরই হয়। যেমন তুমি আজগুবি একটা ভুলের মাশুল গুণছ।

—সেটা কি!

—সেটা তোমার এই রাত দিন ভাবা ; মরে যাবে, মরে যাবে।

—এটা একটা ভুল ভাবনা আমায় বলছ!

—তা না হলে কি!

—আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

—কখন হয়।

—সন্ধ্যা হলেই। ভয় পেলেই। মৃত্যুর কথা মনে হলেই। সেই ছবির মুখ মনে পড়লে।

—আমাদের দেশে মানুষ মরে গেলে তাকে পোড়ানো হয় জানো!

—জানি।

—যত বীরপুরুষই হোন যে একবার শ্মশানে সেই মানুষের পোড়া বিশীর্ণ মুখ চোখ দেখবে—ভয়ে রাতে ঘুমোতে পারবে না। মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে থাকবে। তার জন্য সে যদি ভাবে সে তো মরে যাবে—অথবা আমরা যদি ভাবি মরে গেলে এভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, তবে তো আর বাঁচা যায় না।

—জানি না পুলক আমার কেন এমন হয়। আমি তোমার পাশে এখন শুয়ে ঘুমোব। আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

পুলক বলল, আমার হাঁটুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়।

ব্রাউস হাঁটুতে মাথা রেখে ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে দিল। ওর পায়ে সাদা রঙের জুতো। হাতে সাদা রঙের দস্তানা ছিল, আংটি দেখাবার জন্য সেই যে খুলে রেখেছে আর পরে নি। দু'হাত সে বুকের কাছে রেখেছে। তুমি আবার জাহাজ নিয়ে কোথায় চলে যাবে।

—তুমি ভাল হলেই দেখবে আবার আমি ফিরে আসব।

—সত্যি।

—সত্যি।

ব্রাউস এবার পাগলের মতো লাফ দিয়ে উঠে ওর ঠোঁটে জোরে চুমু খেতে থাকল এবং ক্রমে দু'জন এই পাহাড়ের খাঁজে পৃথিবীর এক নতুন স্বাদ, আহা কি যে সুখ, পবিত্র সুখ এত দিন ব্রাউসের জন্য অপেক্ষা করছিল। কেমন সুন্দর দৃশ্য এই শরীরে। এত যে ঠাণ্ডা, পুলক ওভার কোটে ঢেকে, এই ঠাণ্ডায়, পবিত্র এক রমণীর কামনা বাসনায় ডুবে গিয়ে ডাকল, ব্রাউস আবার আমি এ দ্বীপে তোমার জন্য ফিরে আসব। কেমন ঘুম আসার মতো চোখে সে ব্রাউসকে বুকের কাছে টেনে নিতে নিতে আবেশে চোখ বুজে ফেলল। আর ব্রাউস ছোট একটা রঙিন পাখির মতো ওর বুকের ভিতর ডুবে যেন সহসা জলের নিচে টুপ করে হারিয়ে গেল। ওরা পরস্পর কেউ আর এখন কোনো কথা বলতে পারছে না। এত নিবিষ্ট যে মনেই হয় না সমুদ্র ওদের সব দেখে ফেলেছে।

আট

এ ভাবেই এক ভারতীয় জাহাজী বিকেল হলে বন্দরে নেমে যেত। ইমাহুল্লা দেখতে পেত, মাস্টে একটা পাখি বসেছে। পাখিটা সেই পাখি যে তার প্রিয় পুরুষ পাখিটিকে সমুদ্রে হারিয়ে একা এই জাহাজের পেছনে পেছনে উড়ে এসেছে। এবং যতদিন জাহাজ থাকবে একবার এসে এই সমুদ্র-পাখিটা এই মাস্টের ওপর কিছুক্ষণের জন্য যেমন বসে থাকে আজও তেমন বসে থাকল।

এবার আর এই বন্দরে রোদ উঠছে না। এখন তাড়াতাড়ি এ বন্দর থেকে নোঙর তোলা দরকার। কারণ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমে গেছে। আকাশ সব সময় মেঘাচ্ছন্ন। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় কেউ আর ডেকের ওপর উঠতে পারছে না।

এসব দিনেও সেই ভারতীয় জাহাজী রেনকোট গায়ে দিয়ে কোথায় যায়! ইমাহুল্লা জানে সে যায় ব্রাউসের কাছে। খবর এই যে ব্রাউস পুলককে না দেখে থাকতে পারে না; পুলক—ব্রাউসকে না দেখে থাকতে পারে না—কোনটা ঠিক খবর কেউ এ কথা বলতে পারছে না। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায় পুলকের। সে ডেকের ওপরে উঠেই মাস্টের মাথায় পাখিটা বসে আছে কিনা লক্ষ্য করে। পাখিটা থাকলে সে তাকে প্রথমে উড়িয়ে দেয়। ঝড়ে এই পাখির পুরুষপাখিটা সমুদ্রে মরে গেছে। মাস্টে বসে থাকলেই সে যেন টের পায় পাখিটা নিজের জন্য কোন পুরুষপাখি এখনও ঠিক করে উঠতে পারে নি। পারলে সে মাস্টে এসে বসে থাকত না। সে প্রথম হাতে তালি বাজালেই পাখিটা উড়তে আরম্ভ করে এবং সেই সব ছোট দ্বীপে, যেখানে পাখিরা এখন ডিম পাড়তে এসেছে সেখানে চলে যায়। পুলকের ধারণা ঐসব দ্বীপে না গেলে সে কোনো পুরুষপাখি খুঁজে পাবে না।

ইমাতুল্লা টের পায়, এই এল এবার পুলক। ডেকের ওপর তালি বাজলেই সে টের পায় পুলক অনেক রাত করে ফিরে এসেছে।

পুলকের এত রাত হয়ে যায় কেন একদিন সে এমন জিজ্ঞাসা করলে বলল, আমার পুরানো সেই সব জাতুর খেলা ওকে দেখাচ্ছি।

ইমাতুল্লার এতদিনে মনে হল, পুলক কিছু জাতুর খেলা জানত। যেমন সে সহজেই এক পয়সাকে তু'পয়সা করে ফেলত। সে নাকে হাত দিলে পয়সা, দেয়ালে হাত দিলে পয়সা, যেখানে সে হাত রাখবে সেখান থেকেই পয়সা, উঠে আসবে। খেলাটা সে জাহাজে প্রথম প্রথম দেখিয়েছে। সুতরাং ইমাতুল্লা ভাবল, এখন তবে সে ত্রাউসকে সে সব খেলা দেখাতে রাত করে ফেলেছে।

ক্রাইস্টের কি একটা উৎসব ছিল সেদিন। খেতে বসেছে। সকালের দিকে সামান্য তুষার ঝড় হয়ে গেছে। বাইরের বাগান-গুলোতে কিছু কিছু তুষারকণা ঝরছে। গোলাপ গাছগুলোতে একটাও পাতা নেই। সব যেন মরে যাবে। ত্রাউস আবার কেমন তুঃখী মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আবার সেই বিষণ্নতা ওর চোখে। এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বলে কোথাও বের হতে পারছে না। ত্রাউসের বাবা কাল ত্রাউসকে নিয়ে লাইট-হাউসে চলে যাবে। আর দেখা হবার কথা নয়, কারণ সেখানে পুলক এখন যেতে পারবে না। এখন সমুদ্রের জল বরফ হতে মাত্র আরম্ভ করেছে। ওরা বরফ কাটা জাহাজে যাবে সমুদ্রে। সমুদ্রের জল ভাল করে শক্ত হয়ে গেলে—লাইট-হাউস পর্যন্ত যাওয়া যাবে। পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে। ত্রাউস চলে যাচ্ছে বলে মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে পারে।

খেতে বসেই সে একটা ঠেলা খেল ত্রাউসের কাছ থেকে। পুলক তাকাল বড় বড় চোখে। তার মতো শক্ত এবং কঠিন মানুষকে কুনুই দিয়ে গুঁতিয়ে দেওয়ায় সে ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকটা লক্ষ্য করতেই

বুঝল, ইলিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। সে নিচু হয়ে গব গব করে খেতে আরম্ভ করেছিল, ইলিয়ার প্রার্থনার ভঙ্গী দেখে আর খেতে পারল না। সে মুখে এক টুকরো ভেড়ার মাংস নিয়ে বসে রয়েছে এবং এই টেবিলে সকলে যেমন প্রার্থনা করছে চোখ বুজে সেও প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে রয়েছে।

ত্রাউস ওর এমন ভঙ্গী দেখে না হেসে পারল না। কারণ প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলেও ত্রাউস দেখতে পেল, সে চোখ বুজে আছে। ত্রাউস কুনুই দিয়ে আবার ঠেলা দিলে সে ধড়ফড় করে জেগে ওঠার মতো ত্রাউসের দিকে তাকাল।

বস্তুত পুলকের এ সবই কৌতুক। এবং সে আজ এই দিনে কিছু কিছু কৌতুককর হাসি অথবা কথা বলে যেন, আর তো দেখা হবে না সুতরাং নিজের যা কিছু গুণাগুণ সব ত্রাউসকে দেখিয়ে দেওয়া। সে চলে গেলেই ত্রাউস আবার বিষণ্ণ হয়ে যাবে। সে ত্রাউসকে এত করেও বুঝি ভাল করতে পারল না। বস্তুত ত্রাউসকে ভাল করার চেয়েও ওর কাছে এখন ত্রাউস যদি সামান্য সময়ের জন্য বিষণ্ণ হয়ে যায়, ওর ভিতরটা কেমন বেদনায় মুষড়ে ওঠে।

এখন প্রার্থনার সময়, খাওয়ার সময় নয়। প্রার্থনা শেষে খেতে হয়। কুনুইয়ের ঠেলায় ত্রাউস পুলককে এমন বোঝাতে চেয়েছিল। কারণ সকলেই যখন ভোজ্যদ্রব্য সামনে রেখে প্রার্থনা করছে তখন তুমি কেন খাচ্ছ! ভোজ্যদ্রব্য বলতে গ্রিনপিজ সেদ্ধ। আস্ত বাচ্চা ভেড়ার রোস্ট। বড় একটা কেক। এবং স্যুপ জাতীয় কিছু, ডাল অথবা মাংসের ঝোল। এবং সেই খামার থেকে আনা পুরানো সঞ্চিত দামী মদ। পুলক ভেবেছিল, বুড়ি এবার সকলকে খেতে বলছে। সে নিচু হয়ে দু' চামচ গ্রিনপিজ এবং সামান্য পনীর সহ নরম রোস্ট থেকে মাংস ছিঁড়ে খাবার লোভে মুখে পুরে দিতেই ত্রাউস ঠেলা দিয়েছিল কুনুই দিয়ে। ডেকে বললে অপ্রস্তুত হবে পুলক। সে কুনুইতে ঠেলা মেরে সজাগ করে দিয়েছিল। ইলিয়া

খেতে বলে নি, এখন প্রার্থনা করতে বলেছে—পুলক ঠেলা খেয়ে এসব টের পেয়েছিল। সুতরাং সে মাথা নিচু করে যেমন সাপ ব্যাঙ গিলে বসে থাকে তেমনি সে লজ্জায় চোখ মুখ বুজে বসেছিল। কিন্তু পরে ঠেলা খেয়ে সে এমন চোখ মুখ করে তাকাল যে ব্রাউস হাসিতে গড়িয়ে পড়ল।

মিলান টেবিলের ওপাশে খাচ্ছে। সে মেয়ের এই হাসি দেখে ভাবল, যে এমন হাসতে পারে, সে আর বিষণ্নতায় ভুগতে পারে না। সে পুলককে প্রশ্ন করল, তোমাদের জাহাজ আর কতদিন আছে?

সে বলল, বলতে পারব না স্যার। কবে যে জাহাজ ছাড়ছে কাপ্তানও বলতে পারবে না।

—কেন?

—এজেন্ট অফিস থেকে এখন পর্যন্ত খবরই এল না। আমরা এখান থেকে কি নিয়ে কোথায় যাবো?

—বরফ পড়লে আমাদের লাইট-হাউসে চলে এস। তুমি যদি অকলেণ্ডের বাসে পিয়াড্রোতে নাম, তবে মাইল পাঁচেকের মতো পথ। বরফ পড়লে হেঁটে মেরে দিতে পার পথটা।

কিন্তু ব্রাউস বলল, বাবা, ও যদি ঠিক মতো চিনে যেতে না পারে! বরফ যেখানে পাতলা, সেখানটা ভেঙে জলে ডুবে যাবে।

মিলান বলল, তা ঠিক। তুমি সাবধানে যাবে। খুব রিস্‌কি যাওয়া।

ব্রাউস বলল, না পুলক, তোমাকে যেতে হবে না। এইটুকু বলতেই ব্রাউসের বুকটা ভীষণ মুচড়ে উঠল। এবং বাবাকে তার কেন জানি আজ বড় স্বার্থপর মনে হল।

আর সেদিনই প্রথম পুলক জাহাজে ফিরেছিল টাল মাটাল হয়ে। সে ভীষণ মদ্যপান করে ফিরেছে। সে মাস্টের নিচে এসে অনেকক্ষণ বসে থাকল। ইমাহুল্লা জেগে আছে। কারণ বন্দরে তুষার ঝড় আরম্ভ হয়ে গেছে। এখনও ছোকরাটা ফিরে এল না। সে উঠে

গিয়ে দেখল পুলক মাস্টের নিচে চুপচাপ গুড়ি মেরে এই ঠাণ্ডায় বসে রয়েছে। ওর হাত-পা সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখে মুখে কেমন একটা আর্তি ফুটে উঠেছে।

ইমাহুল্লা বলল, এখানে বসে বসে কি করছ?

সে জড়ানো গলায় বলল, পাখিটা মাস্টে আছে, না উড়ে গেছে?

অথবা সে যেন বলতে চাইল, চাচা আমাকে ওরা একটা পেনি দিয়েছে। সেই পেনিটা ছিল কেকের ভিতর। কেকটা খেতে গিয়ে পেনিটা গলায় কেমন আটকে গেছে। তারপর যেমন আমি ইচ্ছা করলে ওক দিয়ে গলা থেকে পেনি তুলতে পারি, এক পেনি, দু' পেনি, তেমনি করে কেবল সারাক্ষণ আমি খেলা দেখলাম, ওক দিয়ে গলা থেকে পেনি তোলার। ব্রাউস কি হেসেছে! একটু থেমে ফিসফিস গলায় বলল, আসার পথে দেখি ব্রাউস ওর জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। একা। কাছে গেলাম। দেখলাম চোখে জল ব্রাউসের। সে একা একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! জান চাচা আমার কান্না-কান্না ভাল লাগে না। কান্না দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না। ওকে হাসাবার জন্য সেই পেনিটা গিলে ফের ওক দিলাম ওর সামনে। ওক দিতেই জিভে পেনিটা, আবার ওক ফের একটা পেনি জিভে। প্রতি ওকে একটা পেনি, ওর কোঁচড়ে এতগুলো পেনি দিলাম। কিন্তু যাকে কত অবহেলায় হাসিয়েছি, সে আমার পেনির খেলাটা দেখে হাসল না। আরও জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। চাচা আমি জান কান্না-কান্না সহ্য করতে পারি না। তাই একটু খেয়েছি। আচ্ছা একটু টেনেছি বলে কি দোষ করেছি?

—না, কোন দোষ কর নি। ডেকে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। দেখছ কেমন তুষারপাত হচ্ছে। বলে ঠেলতে ঠেলতে সে ওকে নিয়ে সিঁড়ির ভিতর টেনে ফেলে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে বলল, তুমি কি মরে যাবে ভেবেছ!

—কেন এ-কথা বলছ চাচা! আমি মরে যাব কেন?

—এই তুষারপাতে কেউ বের হয়? আর ওদেরই বা কি আক্কেল তোমাকে এ-অবস্থায় ছেড়ে দিল!

—ওদের দোষ দিও না মাইরি। ওরা আমাকে জেটিতে ছেড়ে গেছে। ওরা চলে গেলে আমি কি করব ভেবে পেলাম না। জান, ব্রাউস কাল ওর বাবার সঙ্গে লাইট-হাউসে চলে যাচ্ছে!

ইমাহুল্লা কথা বলছে আর ওর জামাকাপাড় খুলে দিচ্ছে। ভিতরে এখন প্রত্যেক ঘরে ইলেক্‌ট্রিক হিটার জ্বালানো। সুতরাং পুলককে একেবারে চাঙ্গা করে দিল ইমাহুল্লা। তারপর ওর পাজামা, একটা গেঞ্জি, ফুলহাতা ফ্লানেলের জামা গায়ে দিয়ে ওর বাংকে শুইয়ে দিল। অন্যান্য জাহাজীরা এসে ভিড় করেছিল, কিন্তু ইমাহুল্লার এক ধমকে যে যার ফোকশালে চলে গেল।

সারারাত বন্দরে তুষার ঝড়টা ছিল। ভোরের দিকে তুষার ঝড়টা আর থাকল না। এখন ক্রমে বরফ পড়ছে। সমুদ্রের জল পর্যন্ত বরফ হয়ে যাবে। এজেন্ট অফিস থেকে কি মাল বোঝাই হবে কোন খবরই দিচ্ছে না। এবং যে-ভাবে তুষার ঝড় শেষে বরফ পড়তে শুরু করেছে তাতে করে এই বন্দরে অনেকদিন আটকা পড়ে থাকতে হবে। বিকেলের দিকে পুলক কোত্থেকে একটা স্কীপ নিয়ে জাহাজের গঙ্গাবাজুতে ভিড়িয়ে দিল। সে ডাকল, ইমাহুল্লা চাচা দ্বীপে যাবে!

ইমাহুল্লা রেলিঙে উঁকি দিল ডাক শুনে। কে ডাকছে! এখন আর তুষার ঝড় হচ্ছে না। বাইরে বের হওয়া তেমন কষ্টকর নয়। সে উঁকি দিতেই দেখল পুলক জাহাজের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে ডেকের ওপর থেকে বলল, কোথায়?

—লায়ন রকে।

—কেন?

—পাখিটা আর জাহাজে আসছে না। পাখিটা কেমন আছে দেখতে যাব।

—পাখি দেখার তোমার এত গরজ কেন বাপু বুঝি না!

—তুমি না গেলে আমি একাই যাব। দেখে আসি পাখিটা কেমন আছে।

—লায়ন রক তো অনেক দূরে।

—বোটে যেতে হাফ্ এন আওয়ার। সে কম করেই বলল। যেন সে এখন এ-বন্দর সম্পর্কে ইমাহুল্লার চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে।

—এক দেড় ঘণ্টার আগে যেতে পারবে না।

—তা লাগলে আর করার কি আছে। তোমার সেই যে ডিভাইন লেডি, ডিভাইন না ছাই। দু' ঠ্যাঙয়ালা একটা গাছের মতো।

ইমাহুল্লা দেখল একদিনে পুলক কেমন একটু বেয়াড়া হয়ে গেছে। এ-সময় সমুদ্রের অবস্থা ঠিক থাকে না। কোথাও বরফ ভাসতে পারে। এবং বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। জীবন বিপন্ন করে কি দরকার যে যাওয়ার বোঝা যাচ্ছে না। সে বলল, পুলক তুমি মরে যাবে। এখন সমুদ্র ভয়াবহ। কখন কি হবে বলতে পার না।

সে কোন কথাতেই আর কর্ণপাত করল না। বিকেল হলেই ছুটি। কাজ নেই একেবারে জাহাজে। সে কোথায় যাচ্ছে, কি করছে কারো দেখার নেই। সে কাজের সময় উপস্থিত থাকলেই হল। সুতরাং ইমাহুল্লা কিছু বলতে পারল না। একবার ভাবল, ব্রাউসের কাছে যাবে কিন্তু ব্রাউসও নেই। সে তো বরফ কাটা জাহাজে আজ সকালে লাইট-হাউসে চলে গেছে।

নয়

পুলক খাড়ি থেকে একটা স্কীপ ভাড়া করে নিল। সে আজ একা। সেদিন ত্রাউস ওর সঙ্গে ছিল। আজ ত্রাউস নেই। বরং সেই দ্বীপে গেলে লাইট-হাউসটা দেখা যায়। সে মেজ-মালোমের কাছ থেকে দূরবীনটা চেয়ে নিল। অর্থাৎ এই যে ছুটির দিন, এই ছুটির দিনে যে কি করে সেই দ্বীপে যাওয়া যায়, এবং গিয়ে অনেক দূর থেকে দূরবীনে ত্রাউসের মুখ অথবা সেই পাখিটা যা ছিল এতদিনের নিত্য সহচর। অর্থাৎ পাখিটা প্রথম জাহাজে এসেছিল তার পুরুষ-পাখিটাকে নিয়ে। তখন ঝড় সমুদ্রে। সে তার পুরুষ-পাখিটার সঙ্গে এসেছিল। পুরুষ-পাখিটা খুব সম্ভবত রুগ্ন ছিল, সে উড়তে পারত না, তাকে প্রায় সময় মাস্টে বসে থাকতে দেখা যেত। এবং মেয়ে-পাখিটা জাহাজের চারপাশ থেকে অথবা সমুদ্রের ঢেউ থেকে ছোট ছোট ফ্লাইং ফিস ধরে আনত। এবং মাস্টে বসে দু'জনে বেশ খেত। অথচ এত করেও একদিন দেখা গেল পাখিটা বেঁচে থাকল না। সকালে সবাই দেখল মাস্টের নিচে পুরুষ অ্যালবাট্রস পাখিটা মরে পড়ে আছে।

এবং এ ভাবে এক মায়া, মায়া বেড়ে যায়। জাহাজীদের নিঃসঙ্গ সমুদ্রযাত্রায় পাখিটা অদ্ভুত এক প্রিয়জনের ভূমিকা নিল। জাহাজীদের কাজ থাকে না ওয়াচের পর। ওরা পাখিটাকে তখন খাওয়াতে ভালবাসত। নানারকমের ফলমূল, কখনও মাংস এবং মাছ পাখিটার জন্য মাস্টের গোড়ায় রেখে দিলে সে ঠিকঠাক খেয়ে যেত। পাখিটা উড়ে আর সমুদ্রে যেত না। মাঝে মাঝে জাহাজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নীল জলের ওপর এক মায়াবী খেলা সৃষ্টি করত।

পাখিটার জন্য পুলকেরও ভীষণ মায়া ছিল। সে তো পাখিটাকে যেন আলাদা করে ভাবত না। পাখিটা তার কাছে নন্দিনীর মতো

অসহায় ছিল। অথবা ওর মনে হত বেশ হয় যদি সে পাখিটার ডানায় একটুকরো কাগজ আটকে দেয় এবং লিখে দেয়—নন্দিনী আমার এ ভালবাসা নিরন্তর সুষমা বয়ে বেড়ায়। এখন সে পাখিটাকে পেলে যেন আরও লিখে দিত, ব্রাউস বড় সুন্দর নাম।

ব্রাউস লাইট-হাউসে চলে যাবার পর তার কিছুই ভাল লাগছিল না। সে কেমন একগুঁয়ে হয়ে উঠছে। কাপ্তান অথবা মেজ-মালোমকে সে ভয় পাচ্ছে না। মেজ মিস্ত্রিকে সে কেমন একটু অবহেলা করছে। কারণ ওর এ ভাবে জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। তবু সে ছোট, এবং কম বয়সী বলে তাকে নানা ভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু সে যেন বড় বেশি সে সুযোগ নিয়ে ফেলছে। নিজের মনেই সে কেমন সামান্য নিজেকে অপরাধী ভাবল।

পুলকের বোট ছিল সাদা রঙের। দুপুরের দিকে যে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত ছিল এখন সেটা নেই। এই দুদিনেই কেমন সমুদ্রের চেহারা পালটে গেছে। মাঝে মাঝে সাদা সাদা ফেনার মতো ঢেউ উঠছে, অথচ সাদা ভাবটা ভেঙে যাচ্ছে না। এবং ক্রমে এরাই জমতে জমতে বরফ হয়ে যাবে। কিনারে যে সব গাছপালা আছে সব ক্রমে কেমন নেড়া হয়ে গেল। আশ্চর্য ঝড়ো হাওয়া আর বড় বড় ঢেউ। ওর স্কীপটা জাহাজ থেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ইমাদুল্লা জাহাজে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে রেলিঙে ঝুঁকে আছে। স্কীপটা বেশ এঁকে বেঁকে ঢেউয়ের মাথায় একবার হারিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। এখনও এ সব অঞ্চলে চোরা স্রোত সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে ওঠে নি। ভয়ঙ্কর সব চোরা স্রোত। এই সব চোরা স্রোতে পড়ে গেলে সাধ্য কি পুলক স্কীপের স্টিয়ারিং ঠিক রাখে। চোরা স্রোত সম্পর্কে ওকে কিছুটা যেন বলে দেওয়া উচিত ছিল।

ঝড়ো বাতাসের জন্য ইমাদুল্লা বেশি সময় ডেকে দাঁড়াতে পারল না। জাহাজে এখন তেমন কোন কাজ নেই। জাহাজের যা কিছু

রঙ করা বাকি ছিল এই যেমন ডেক, মেসরুম, ফরোয়ার্ড পিকের চার নম্বর ডেরিক সবই রঙ করা হয়ে গেলে বাকি থাকে শুধু সব দড়াদড়ি তুলে রাখা। এখন জাহাজীরা আফটার পিকে সব দড়াদড়ি বাঁধছে। ওয়ারপিন ড্রামের হাসিল পালটে দিচ্ছে। কাজ না থাকে তো খৈ ভাজ। এমনই একটা ব্যাপার এখন জাহাজে চলছে। অথচ জাহাজটা কেন যে বন্দর ছাড়ছে না বোঝা যাচ্ছে না। যে ভাবে ক্রমে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাতে করে বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল। নাকি কাপ্তান খবর পেয়েছে, সমুদ্রে এক ভয়ঙ্কর সাইক্লোন ওঠার সম্ভাবনা আছে। সব না দেখে জাহাজ ছাড়া ঠিক হবে না।

ইমাদুল্লা এবার সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে এল। ওর ফোকশাল থেকে পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্র তেমন ভালভাবে দেখা যায় না। তবু সে অবাক, পোর্টহোলের নীল কাচে বিন্দুমতো একটা সাদা রঙের দৃশ্য ভাসতে দেখল। প্রথম সে বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। সমুদ্রের জল নীল বলে কাচটা কেমন সব সময় নীল রঙের হয়ে থাকে। সেখানে সাদা এই বিন্দু কি ভাসছে। সে কাছে গেল। হাত রাখল। এবং আশ্চর্য সে দেখল, অনেক দূরের পুলকের সাদা রঙের বোটটা এখনও এই পোর্টহোলের কাচে ছায়া ফেলছে। অনেক দূরে অথচ ছায়া, কেমন মায়া বেড়ে যায় এ ভাবে তার। পুলকের জন্য সে আশ্চর্য এক বেদনায় মুখ ভার করে রাখে। ব্রাউসের ভালবাসায় ছেলেটা কেমন হয়ে গেল।

এবং এ ভাবে ইমাদুল্লা জানে জাহাজী মানুষের অনেক দুঃখ। এভাবে একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রার পর তীরের কোন ছবি, আপেলের গাছ, সূর্য ওঠা পাহাড়ের ওপর, জাহাজীদের পাগল করে দেয়। আর এতো মেয়ে। আশ্চর্য নাম, ব্রাউস। লম্বা। হাত-পা লাবণ্যে ভরা। নীল চোখ। সোনালি রঙের চুল। চোখে মায়া। চোখ খুব খুলে তাকায় না ব্রাউস। মুখ নিচু করে বসে থাকার অভ্যাস।

এমন এক মেয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে পুলক। কেমন একটা ভয় এখন ইমাহুল্লাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই যে ওর যাওয়া, উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়ানো দ্বীপে দ্বীপে, সবটাই কেমন যেন পুলক আবেগের বসে করছে। জাহাজীদের এই আবেগ ভাল না।

এই আবেগ জাহাজীদের ভাগ্যে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দেয়। যেমন এই পুলক এখন ইচ্ছা করলে এমন সব অঘটন ঘটাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে যে সামান্য মৃত্যু বড় তুচ্ছকর ঘটনা। সে যাচ্ছে লায়ন রকে। সেখানে লালবর্ণের পাথর। এবং উঁচু নিচু দ্বীপে নানারকম পাখির বাস। সে যাচ্ছে এই মাস্টে বসে থাকা পাখিটার অনুসন্ধানে। ওটা কোন ঘটনাই নয়। কারণ সে জানে এই যে পুলক বের হয়ে গেল, দ্বীপে যাবে বলে চলে গেল—সেটা শুধু ব্রাউসকে দেখবে বলে। সে যদি সেই দ্বীপে যায় তবে ব্রাউসের বাবা যে দ্বীপে থাকে সেটা সে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সে যদি দক্ষিণের দিকের দ্বীপটায় হেঁটে হেঁটে চলে যায় তবে খুব কাছে চলে যাবে। এবং খাড়া পাহাড়ের উত্তরের দিকটা তবে তার চোখে পড়বে।

ইমাহুল্লা বুঝতে পারল না পুলক সোজাসুজি ব্রাউসের দ্বীপে চলে যাচ্ছে না কেন। কেউ তো ওকে বারণ করে নি। সে তো অনায়াসে চলে যেতে পারে। পাখি দেখার নাম করে যাবার কি দরকার।

কিন্তু ইমাহুল্লা জানে না, এক ভীষণ অভিমান পুলককে কেমন খাপছাড়া করে দিচ্ছে। ব্রাউসের সোজাসুজি বলা, না পুলক তুমি যাবে না, এই যে তারা তোমাকে যেতে বলছেন, এটা ঠিক না, বাবা তোমার কথা কিছু বিবেচনা করছেন না, বাবা কেবল তাঁর লাভের দিকটা দেখছেন—তিনি জানেন, তুমি এলেই আমি ভীষণ খুশি থাকব, তিনি জানেন তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে তাঁর লাভ, এমন কি আমার ভয় হয়, বাবা তোমাকে কোথাও নিয়ে রেখেও দিতে পারেন,

বাবা যে এখন কি পারেন না ভাবতে পারছি না, তিনি তোমার চেয়ে আমার কথা বেশি ভেবেছেন, বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে তুমি অনায়াসে আসতে পারবে দ্বীপে, কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলে অর্থাৎ, এমন সব পাতলা আবরণ থাকে বরফের, বোঝাই যায় না, পা দিলে পাতলা কাচের মতো মুড়মুড় করে ভেঙে যাবে, এবং নিচে ডুবে গেলে চোরা স্রোত, তুমি যে সমুদ্রের ভিতর কোথায় হারিয়ে যাবে কেউ জানবে না। পুলক তুমি এলে, এ-ভাবে এলে আমি বড় দুঃখ পাব।

তখন মেয়েটা পুলককে অত কিছু বলে নি, শুধু বলেছে, তুমি আসবে না পুলক। পুলক সেজন্য চট করে এমন একটা দ্বীপের কাছাকাছি থাকবে যেখান থেকে চুরি করে ত্রাউসকে দেখা যায়।

পুলক এবার পিছন ফিরে তাকাল। সে আর তার জাহাজের মাস্তুল দেখতে পাচ্ছে না। সে এখন বুঝতে পারছে বেশ দূরে চলে এসেছে। লায়ন রক এবং পাশাপাশি দ্বীপগুলো ক্রমশ বড় লাগছে। এদিকটাতে বরফ জমছে না। কিনারায় সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে জমে যাচ্ছে। এবং এই সব পাশাপাশি দ্বীপগুলোর চারপাশে বরফ জমে থাকতে পারে। কি ঠাণ্ডা! সে হাতে দস্তানা পরেছে। সাদা চামড়ার দস্তানা। মাথায় মাংকি ক্যাপ। এবং লম্বা ওভার কোট। পায়ের নিচে সালদেরাজ। সাদা রঙের মোজা। আর সাদা রঙের জুতো। তারপর গামবুট নিয়েছে। প্রয়োজন হলে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় অথবা দ্বীপে যদি কোথাও কোন জলাভূমি থাকে সে সেসব অনায়াসে পার হয়ে যাবে।

সে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে রয়েছে। প্রায় মোটর বোটটা রাজহাঁসের মতো সমুদ্রের জল কেটে উড়ে যাচ্ছে। কিছু সমুদ্র-পাখি ওর বোটের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। লেগুনের দু'পাশটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। যত সমুদ্রের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, তত দু'পাশের পাহাড় নানারকম গাছপালা নিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। বেশ লাগছিল পুলকের।

পাখিটার নাম করে সে বের হয়ে পড়ল। চারপাশটা ভীষণ নির্জন। কেবল মোটর বোটের একটা বিশ্রী শব্দ। বরফ পড়বে বলে অথবা তুষারপাতের সময় ভেবে মানুষেরা খুব একটা কেউ আর বোটে সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে যাচ্ছে না। সে যাচ্ছে, কারণ তার সব বলতে নন্দিনী নামের মেয়েটি কোন এক আশ্চর্য সকালের মতো তার কাছে আবার এসে যেন হাজির। ব্রাউসকে সে কেন জানি পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে ভেবে ফেলেছে।

সে যখন দ্বীপটায় ঢুকে গেল তখন সূর্যাস্তের সময়। সকাল সকাল সূর্যাস্ত হচ্ছে। এখানকার বিকেল বেশিক্ষণ থাকে না। অথবা সকাল শেষ হলেই বিকেল আরম্ভ হয়ে যায়-এমন ভাব। সূর্য দিগন্ত রেখায় ঘুরে ঘুরে অস্ত গেলে একটা অদ্ভুত আলো, এবং স্নিগ্ধ ভাব এই দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে থাকে। পুলক বোট একটু ওপরে তুলে ফেলল। চারপাশটায় সমুদ্রের স্রোত ঘুরে ঘুরে নেমে যাচ্ছে বলে জল জমতে পারে নি। অথবা এ-অঞ্চলে কোথাও উষ্ণপ্রবাহ আছে সমুদ্রের যা কোন কোন দ্বীপের চারপাশটাকে সব সময় নীল করে রাখে। যত ঠাণ্ডাই নেমে আসুক না কেন কখনও কেউ এ-সব দ্বীপের চারপাশটায় বরফ জমতে দেখবে না। বোধ হয় এই দ্বীপটাও তেমন কিছু একটা হবে। এমন সব গাছ রয়েছে দ্বীপে যে সে হেঁটে যেতে গেলে গাছগুলো ওর কোমরের নিচে পড়ে থাকে। কোথাও সে একটা বড় গাছ দেখতে পেল না। দ্বীপে গেলেই হাজার হাজার পাখি ওর মাথার ওপর উড়তে লাগল। ওরা টের পেয়েছে—এই সব মনুষ্যের অপোগণ্ড এসে ওদের ডিম চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু তুষারপাতের সময় ওরা ডিম প্রসব করে না বলে এখন পাখিরা তেমন ভয়াবহ নয়। অন্য সময় হলে ওরা ওকে তাড়া পর্যন্ত করত।

তারপর সে সামনের দুটো ছোট ঢিবি পার হয়ে গেলে দেখল, পাখিগুলো আবার যার যার আস্তানায় ফিরে গেছে। সে দুপাশেই বাসা দেখতে পাচ্ছে। বাচ্চা পাখিগুলো পাথরের খাঁজ থেকে, ছোট

ছোট গর্ত থেকে মুখ বের করে ওকে দেখছে, সে পাখিদের এমন আস্তানা কখনও দেখে নি। সব গোল বালির গর্ত। নানাবর্ণের নুড়ি পাথর এবং কিছু খড়কুটোয়। আর এমনভাবে খড়কুটোগুলো ভাঁজ করা যে দেখলে মনে হবে ঠিক পাটি বোনার মতো বোনা।

কিন্তু যা পুলককে সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য করল, এই সব পাখিরা কোথায় যে মলমূত্র ত্যাগ করে। কোন মলমূত্রের গন্ধ সে পেল না। মনে হয় ভীষণ পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। কেউ ধুয়েমুছে রেখে গেছে। তারপর সে আরও কিছু দূর হেঁটে গেল, দেখল একটা সমুদ্রের ভীষণ পাতলা ঢেউ এই দ্বীপের ওপর দিয়ে ক্রমে ভেসে যাচ্ছে। ওর পায়ের পাতা ভিজে গেল। পাখিগুলো কি করে যে টের পায় এ-সব, সে জানে না। সব পাখিরা নিমেষে হাওয়ায় পাখা গ্লাইড করতে থাকল। ছোট ছোট পাখিরা, যাদের ওড়বার বয়স হয় নি, ওদের জন্য প্রত্যেক বাসার কাছে একটা হাঁটু সমান পাথর। জলটা উঠে এলেই ছোট ছোট পাখিরা কোনরকমে উড়ে গিয়ে পাথরটায় বসে পড়ে। যখন শীতকাল তখনই হয়তো এমনটা ঘটে। সে ভাবল, ইমাছুল্লা চাচাকে বলে সব জেনে নেবে। এবং সেই জল ওদের মলমূত্র ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়।

এখন পুলক আর কিছু ভাবছে না। সে যাবে দক্ষিণের দ্বীপটাতে। সেখানে গেলে সে, লাইট-হাউসের আলো পড়ছে সমুদ্রে, দেখতে পাবে। এখন সূর্যাস্তের সময়। এখন ব্রাউসের বাবা আলো জ্বালবে না। আর একটু পরে হয়তো সে এ-পাহাড় থেকেই ডায়নামোর শব্দ পাবে—খুব নির্জন বলে, সমুদ্রের শোঁ শোঁ বাতাস, এবং তুষারপাতের জন্য পাতলা মেঘেরা পর্যন্ত আকাশের নিচে নেমে আসতে পারছে না তখন—সে শুনতে পাবে অনেক দূর থেকে মৃদু একটা শব্দ, প্রায় কম্পনের মতো ব্যাপারটা, সে টের পাবে তখন সিঁড়ি বেয়ে ব্রাউসের বাবা ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঠিক ঠিক আলো ফেলছে কিনা, অথবা কোন গোলযোগের আশঙ্কা দেখা

দিলে যে ভয়াবহ কঠিন মুখ ব্রাউসের বাবা করে রাখবে—সেটা যেন সে এখানে দাঁড়িয়েও টের পাবে।

পুলক যেতে যেতে একবার সেই পাখিটার নাম করে ডাকল। কারণ জাহাজে ওরা পাখিটায় একটা নাম দিয়েছিল। যেমন সবারই জাহাজে কোন না কোন নাম থাকে তেমনি পাখিটারও একটা নাম ছিল। পাখিটাকে ওরা ডাকত—কপিলা বলে। বাঙালী জাহাজীদের দেওয়া নাম সাহেব-সুবো অফিসারেরা ধরতে না পারলে ওরা সবাই মিলে কপিলা মানে কি, ইংরেজিতে তার কি ব্যাখ্যা করা যায় এমন একটা সমস্যায় পড়ে গেলে একসময় সবাই সমুদ্রের নিকষ ঘন কপিশ রঙের মেঘ দেখে যেন মানেটা ধরতে পেরেছিল। কেউ আর শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সবাই একসঙ্গে জাহাজ থেকে ডেকে উঠেছিল—ক···পি···লা। একসঙ্গে এমন শব্দের এক উচ্চারণ সারা জাহাজময় ডেকময় এবং সমুদ্রে আশ্চর্য ভালবাসা নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। এখন যেন তেমনি তেমনি একটা গভীর রঙ অর্থাৎ সে যদি জোরে ডেকে ওঠে ক···পি···লা তবে সেই এক নিদারুণ দুঃখ এবং বেদনার কথাই ধরা পড়বে। পুরুষ পাখিটার জন্য কপিলার সেই বড় বড় চোখ এবং বিষণ্ণতা এখনও যেন ধরতে পারে। এবং নিজের ভিতর তেমন এক দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকলে গভীরে ডুবে যেতে সব সময় ভাল লাগে। সে এই যে জোরে জোরে ডাকছে—ক···পি···লা, এই যে দ্বীপের ভিতর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, ক···পি···লা, ক···পিলা, সারা দ্বীপময় এক করুণ চেনা শব্দ ক···পি···লা, এবং কোথাও সাড়া নেই যার, কারণ পাখিটাকে জাহাজে নাম ধরে ডাকলে কাছে আসত, ডাকত, অর্থাৎ কথা বলার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, এখন তার এতটুকু আভাস নেই। সে ভেবে পেল না—কেন এমন হয়, পাখিটা হয়তো ভয়ে ডাকতে পারছে না, ওর পুরুষ-পাখিটা তাকে ধমক দিচ্ছে—এবং এ-ভাবেই সারা দ্বীপময় এক মেয়ে নাম যার নন্দিনী, এবং যে শৈশবে ছিল তার

ছোট গর্ত থেকে মুখ বের করে ওকে দেখছে, সে পাখিদের এমন আস্তানা কখনও দেখে নি। সব গোল বালির গর্ত। নানাবর্ণের নুড়ি পাথর এবং কিছু খড়কুটোয়। আর এমনভাবে খড়কুটোগুলো ভাঁজ করা যে দেখলে মনে হবে ঠিক পাটি বোনার মতো বোনা।

কিন্তু যা পুলককে সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য করল, এই সব পাখিরা কোথায় যে মলমূত্র ত্যাগ করে। কোন মলমূত্রের গন্ধ সে পেল না। মনে হয় ভীষণ পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। কেউ ধুয়েমুছে রেখে গেছে। তারপর সে আরও কিছু দূর হেঁটে গেল, দেখল একটা সমুদ্রের ভীষণ পাতলা ঢেউ এই দ্বীপের ওপর দিয়ে ক্রমে ভেসে যাচ্ছে। ওর পায়ের পাতা ভিজে গেল। পাখিগুলো কি করে যে টের পায় এ-সব, সে জানে না। সব পাখিরা নিমেষে হাওয়ায় পাখা গ্লাইড করতে থাকল। ছোট ছোট পাখিরা, যাদের ওড়বার বয়স হয় নি, ওদের জন্য প্রত্যেক বাসার কাছে একটা হাঁটু সমান পাথর। জলটা উঠে এলেই ছোট ছোট পাখিরা কোনরকমে উড়ে গিয়ে পাথরটায় বসে পড়ে। যখন শীতকাল তখনই হয়তো এমনটা ঘটে। সে ভাবল, ইমাহুল্লা চাচাকে বলে সব জেনে নেবে। এবং সেই জল ওদের মলমূত্র ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়।

এখন পুলক আর কিছু ভাবছে না। সে যাবে দক্ষিণের দ্বীপটাতে। সেখানে গেলে সে, লাইট-হাউসের আলো পড়ছে সমুদ্রে, দেখতে পাবে। এখন সূর্যাস্তের সময়। এখন ব্রাউসের বাবা আলো জ্বালবে না। আর একটু পরে হয়তো সে এ-পাহাড় থেকেই ডায়নামোর শব্দ পাবে—খুব নির্জন বলে, সমুদ্রের শোঁ শোঁ বাতাস, এবং তুষারপাতের জন্য পাতলা মেঘেরা পর্যন্ত আকাশের নিচে নেমে আসতে পারছে না তখন—সে শুনতে পাবে অনেক দূর থেকে মৃদু একটা শব্দ, প্রায় কম্পনের মতো ব্যাপারটা, সে টের পাবে তখন সিঁড়ি বেয়ে ব্রাউসের বাবা ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঠিক ঠিক আলো ফেলছে কিনা, অথবা কোন গোলযোগের আশঙ্কা দেখা

দিলে যে ভয়াবহ কঠিন মুখ ত্রাউসের বাবা করে রাখবে—সেটা যেন সে এখানে দাঁড়িয়েও টের পাবে।

পুলক যেতে যেতে একবার সেই পাখিটার নাম করে ডাকল। কারণ জাহাজে ওরা পাখিটায় একটা নাম দিয়েছিল। যেমন সবারই জাহাজে কোন না কোন নাম থাকে তেমনি পাখিটারও একটা নাম ছিল। পাখিটাকে ওরা ডাকত—কপিলা বলে। বাঙালী জাহাজীদের দেওয়া নাম সাহেব-সুবো অফিসারেরা ধরতে না পারলে ওরা সবাই মিলে কপিলা মানে কি, ইংরেজিতে তার কি ব্যাখ্যা করা যায় এমন একটা সমস্যায় পড়ে গেলে একসময় সবাই সমুদ্রের নিকষ ঘন কপিশ রঙের মেঘ দেখে যেন মানেটা ধরতে পেরেছিল। কেউ আর শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। সবাই একসঙ্গে জাহাজ থেকে ডেকে উঠেছিল—ক···পি···লা। একসঙ্গে এমন শব্দের এক উচ্চারণ সারা জাহাজময় ডেকময় এবং সমুদ্রে আশ্চর্য ভালবাসা নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। এখন যেন তেমনি তেমনি একটা গভীর রঙ অর্থাৎ সে যদি জোরে ডেকে ওঠে ক···পি···লা তবে সেই এক নিদারুণ দুঃখ এবং বেদনার কথাই ধরা পড়বে। পুরুষ পাখিটার জন্য কপিলার সেই বড় বড় চোখ এবং বিষণ্ণতা এখনও যেন ধরতে পারে। এবং নিজের ভিতর তেমন এক দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকলে গভীরে ডুবে যেতে সব সময় ভাল লাগে। সে এই যে জোরে জোরে ডাকছে—ক···পি···লা, এই যে দ্বীপের ভিতর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, ক···পি···লা, ক···পিলা, সারা দ্বীপময় এক করুণ চেনা শব্দ ক···পি···লা, এবং কোথাও সাড়া নেই যার, কারণ পাখিটাকে জাহাজে নাম ধরে ডাকলে কাছে আসত, ডাকত, অর্থাৎ কথা বলার ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, এখন তার এতটুকু আভাস নেই। সে ভেবে পেল না—কেন এমন হয়, পাখিটা হয়তো ভয়ে ডাকতে পারছে না, ওর পুরুষ-পাখিটা তাকে ধমক দিচ্ছে—এবং এ-ভাবেই সারা দ্বীপময় এক মেয়ে নাম যার নন্দিনী, এবং যে শৈশবে ছিল তার

একমাত্র সঙ্গী, ভালবাসার মানেটা তখনও স্পষ্ট নয়, অথচ একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠার ভিতর আশ্চর্য এক ভালবাসার সুষমা আছে যা ধরা যায় না, অথচ ছোঁয়া যায়, এমন সুষমার ভিতর সে এখন পাখিটাকে দেখতে চায়।

আর তখনই দেখল দ্বীপের শেষে সেই লাইট-হাউসের পাহাড়। পুলক দেখল, সমুদ্র থেকে খাড়া পাহাড়টা উঠে গেছে! সে লাফিয়ে লাফিয়ে এসেছে, এবং এদিকটা খুব উঁচু বলে সে নিচ থেকে দেখতে পায় নি, সামনের কিছুটা বনঝোপ এবং টিলা পার হলেই ফের সমুদ্র, সমুদ্রের ওপাশে একটা পাথরের দেয়াল একেবারে খাড়া অনেক ওপরে উঠে গেছে। এমন কি সেই পাহাড়ে এতটুকু খাঁজ নেই যে একটা সমুদ্র পাখি যেখানে বাসা বানাতে পারে। সে তার জায়গা থেকে এতটুকু নড়তে পারল না।

পৃথিবীতে এমন সব সুন্দর জায়গা ঈশ্বর সৃষ্টি করে রেখেছেন! এখানে সে সমুদ্রে এতটুকু ঢেউ দেখতে পেল না। ইচ্ছা করলে সে সাঁতরে যেন সামনের পাহাড়টায় উঠে যেতে পারে। সে চারপাশটা ভাল করে দেখছে, বাঁ দিকে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেখানে কোনো গাছপালা নেই। কেবল বালি। এবং বালির সঠিক কি রঙ ধরা যাচ্ছে না। কারণ বালি, গাছপালা এবং দ্বীপের সব স্বাভাবিক রঙ এই সূর্যাস্তে কেমন স্বপ্নবৎ দেখতে। অথবা সে যেন কোনো রঙিন ছায়া ছবির নায়ক। সে এই দ্বীপে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

তারপর সে আর যা দেখল, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। সে সেদিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে যতটা কাছে মনে হচ্ছে পাহাড়টা, ওপরের দৃশ্য দেখে, তত কাছে নয় পাহাড়টা-বরং বেশ দূর। সে চোখে এবার দূরবীনটা তুলে ধরল। ঠিক, যা আন্দাজ করেছে তাই।

দশ

এ-ভাবে একটা রাত কেটে গেল ত্রাউসের। ভাল ঘুম হয় নি রাতে। বাবা বুঝতে পারছিলেন, ত্রাউস সারারাত ঘুমোয় নি। কেমন কেবল এ-পাশ ও-পাশ করছে। মাঝরাতে বাবা উঠে একবার ত্রাউসের শিয়রে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন ত্রাউস এ-পাশ ও-পাশ না করে খুব ভাল মেয়ের মতো ঘুমের ভান করে থেকেছে। কারণ সে চায় না তার জন্য বাবা কোনো কষ্ট পাক। সে যদি না ঘুমায়, বাবা চিন্তা করবে। বাবার চোখ মুখ দেখলে সে সকালে টের পায়—বাবা ভীষণ কিছু ভাবছে। সে বাবাকে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে। কিন্তু তারপরই মনে হল বাবাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসলে কাল রাতে সে ঘুমোতে পারল না কেন। বাবা ওর শিয়রে এসে দাঁড়ালে ওকে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে হল কেন। সে তখন কেমন উদাস হয়ে যায়।

এবং এই উদাসীনতা সে টের পায় জীবনের পক্ষে খুব খারাপ। আজ আর অন্যদিনের মতো সে বাগানের ভিতর হেঁটে বেড়ায় না। রেলিঙের ধারে এসে ফুলের সব গাছপালায় কি সব নূতন কুঁড়ি এসেছে সে আজ খুঁজে দেখে না। বারান্দার ডেক চেয়ারে চুপচাপ কেবল বসে থাকতে ভাল লাগে।

বাবার ডিউটি সকাল ছটায়। বাবা যখন বের হয়ে গেছেন তখন অন্ধকার ছিল। এখন এখানে সকাল হতে সাড়ে আটটা। তখন দিগন্তে কিছুটা চাঁদের ক্যাকাসে আলো নিয়ে সূর্য উঠে আসে। মনে হয় শীতের জন্য সূর্য ঠিক কিরণ দিতে পারছে না। এবং কখনও সূর্যের উত্তাপ আছে বোঝা যায় না। বাবা আসবেন নটায়। তখন ঘণ্টাখানেকের মতো টিফিন। বাবা এসেই খুব তাড়াতাড়ি প্যানট্রিতে ঢুকে যাবেন। বেসিনে সব কাপ প্লেট ধুয়ে সামান্য মারমেলেডের সঙ্গে

রুটি কিছু গ্রিনপিজ সেদ্ধ এবং দুটো বিসকুট এই দিয়ে টিফিন। একটা আপেল, কিছু আঙুর থাকবে সঙ্গে। বেশ এই দিয়ে ওদের টিফিন হয়ে গেলে আবার এই কোয়ার্টারে কেমন নির্জনতা। এখানে এসে ওর ভাল লাগছে না। সে ইচ্ছা করলে দিদিমার কাছে থাকতে পারত। কিন্তু সে টের পায় বাবা ওকে ছাড়া থাকতে পারে না বেশিদিন। ছুটি নিয়ে বাবা চলে যান তাঁর কাছে।

সে এখন ভীষণ একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। ওদের কোয়ার্টার পার হলে বোসানদের কোয়ার্টার। এবং পরে চিফ-এনজিনিয়ারের বাংলো। বাংলোটা খালিই পড়ে থাকে সব সময়, তিনি মাঝে মাঝে ইনসপেক্সানে এলে এখানে ওঠেন। ত্রাউসের জন্য তিনি মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব লতানে গাছের চারা নিয়ে আসেন। তখন ত্রাউস খুব লতাপাতায় অথবা গাছে ফুল ফুটানো পছন্দ করত। এখন সে সব তার ভাল লাগে না। কিছুই ভাল লাগছে না। একদিনেই তার মনে হয়েছে অনেক দিন হল এখানে সে এসেছে। কেমন একা একা ভাব। এই পাহাড় এবং দ্বীপ তার একসময় কি ভাল লাগত! অথচ অসুখটা তাকে আক্রমণ করলে সে কেমন হয়ে গেল। তখন পৃথিবীর যাবতীয় মায়া তার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। আবার একটা মায়া ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল প্রাণে। সেটা যে কেন সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু সে ক্রমে আবার কোথাও যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

ত্রাউস দেখল বাবা পার্লারে কটা গোলাপ ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে। তুষারপাতের সময় গোলাপের রঙ ঠিক থাকে না। কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। এবং পাপড়ি ঝরে যাচ্ছিল। এবার বোঝাই যায়, সে যেমন শরীরের ভিতর এক আশ্চর্য শীতলতায় ভুগে ভুগে মরে যাবে তেমনি এই গোলাপ গাছগুলো। সবই নেড়া নেড়া। বাবা মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলছিলেন প্যানট্রি থেকে। সে বুঝতে পারছে বাবা যতক্ষণ থাকবেন ঠিক এ-ভাবে কথা বলে যাবেন।

—বুঝলে ব্রাউস বিকেলে তোমাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাব।

বারান্দায় ব্রাউস মাথায় হাত রেখে নিচের সমুদ্র দেখছে। সেখানে কেউ নেই। ঠাণ্ডা বলে কেউ নেমে যাচ্ছে না। বারান্দার চারপাশটা কাচে ঢাকা। কাচে এখন নানারকমের নকশা তৈরি হবে। যত শীত পড়বে, ঠাণ্ডা বাড়বে তত কাচে বরফ জমে ছোট ছোট লতাপাতায় গাছ তৈরি হবে। এবং এটা একটা খেলা ছিল ব্রাউসের। সে আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কাচ থেকে সব লতাপাতা তুলে ফেলত অথবা মুছে দিত। আবার সকাল হলে সে দেখতে পেত কারা সব এক দল ভেড়ার পাল কাচের ভিতর ছবির মতো এঁকে দিয়ে গেছে। সে আবার মুছে দিত, সেখানে সে ফের পরদিন দেখত একটা ছোট্ট পাহাড়ের ছবি। এভাবে সারাটা শীতের সময় যখন কেবল বরফ জমে আছে, চারপাশটা কি আশ্চর্য সাদা, এবং গাছে একটা পাতা নেই, তুষারপাতের রিনরিন শব্দ তখন সে এই দ্বীপটায় একটা সোনালি রঙের ফ্রক গায়ে দিয়ে স্কি করে বেড়াত। তার কাছে সারা দ্বীপটা বরফ পড়ে তখন মায়াবী এক দেশ। সে এ-পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে, এ-উপত্যকা থেকে সে উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতো। এবং কখনও দিগন্ত রেখায় পলাতক সূর্যের আলো এসে সহসা উঁকি মারলে, নীল জলের চারপাশে একটা রূপোলি রাজকন্যার দেশ যেন। সে, তার বাবা, বোসান, তার মা বাবা এ-রাজ্যের নিবাসী। আর আছে এক বুড়ো। সে এখান থেকে কোথাও যায় না। তার কাজ নেই। তবু সে কাজ করে।

কারণ এই বুড়োর সারাটা জীবন এই দ্বীপে কেটে গেছিল। তার বাবা মা এসেছিল লাইট-হাউসের কিপার হয়ে। মা বাবার পর সে এবং তার স্ত্রী। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার ফাঁকে এখানে আসত। এবং ছুটি কাটিয়ে আবার চলে যেত। এ-ভাবে দিন গেলে বুড়োর বয়স বাড়ে। ছেলেমেয়েরা বিয়ে থা করে আর